Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রান্তজনের অন্তঃকথন : প্রসঙ্গ জলদাসীর গল্প

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	তাশরিক-ই-হাবিব
Published online	October 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v50i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.4
Pages	৯৫-১২৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

প্রান্তজনের অন্তঃকথন : প্রসঙ্গ *জলদাসীর গল্প*

Check for updates

তাশরিক-ই-হাবিব*

প্রান্তজনের[১] কথাকার হিসেবে হরিশংকর জলদাস (জ. ১৯৫৫) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠীর নিকট ক্রমশই একটি পরিচিত ও সমীহ আদায়কারী নাম হয়ে উঠেছেন। তাঁর পারিবারিক বৃত্তান্ত, বেড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত এবং কথাসাহিত্যিক হিসেবে সৃষ্টিশীলতাকে শৈল্পিক মাত্রায় উন্নীতকরণ আদৌ কোনো খেয়াল বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি জীবনকে সতর্ক অন্তর্দৃষ্টি থেকে অবলোকন করে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের রূঢ় জীবনবাস্তবতাকে শিক্ষিত পাঠকের নিকট উপস্থাপনের আগ্রহেই ছোটগল্প লেখেন। বহুযুগ ধরে সনাতন ধর্মাবলম্বী বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজের তলদেশে শূদ্র[২] হিসেবে নিগৃহীত হয়ে চলেছে সংখ্যাগুরু কায়িক শ্রমজীবী মানুষেরা। তাদের[৩] প্রতিনিধি হয়েও তিনি উক্ত সমাজশাসিত অনুশাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকেননি। নিত্যদিনের যাপিত জীবনে আহৃত অভিজ্ঞতারাশির সঙ্গে সংবেদনশীল মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের দুর্বার উদ্দীপনা তাঁকে প্রতিনিয়তই উদ্বুদ্ধ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচিত্র জীবনচর্যাকে ছোটগল্পের আধারে বিনির্মাণে।[৪] জেলে, মাঝি, জলশ্রমিক, মুচি, ভবঘুরে উন্মাদ, অসহায় যুবতী গৃহবধূ, পতিতা ও তার দালাল, শিশু-কিশোর, দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ বিভিন্ন শ্রেণিচরিত্রের সমবায়ে প্রান্তজনের অকথিত জীবনাখ্যানকে কুশলী বয়ানে তিনি সিদ্ধহস্ত।[৫] নিজস্ব পরিমণ্ডলের অন্তর্গত চেনা মানুষদের সঙ্গে পরিচিতি ও সখ্য, তাদের সঙ্গে একাত্মভাবে মেশার সুযোগ, জীবনসংগ্রামের নিরন্তর স্পৃহাবশত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার আন্তর্গরজে পারিবারিক পেশাকে গ্রহণ সত্ত্বেও শিক্ষিত মানুষের আত্মসচেতনতাবশত সৃজনশীলতা প্রকাশের আকুতি[৬] — প্রভৃতির মিথস্ক্রিয়াই তাঁর লেখকসত্তার উদ্বোধক। স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বরূপকে পাঠককুলের নিকট উপস্থাপনের আগ্রহই হরিশংকর জলদাসকে অনুপ্রাণিত করেছে উপর্যুক্ত গল্পসমূহ রচনায়, যার গ্রন্থরূপ *জলদাসীর গল্প*।[৭]

'কোটনা' গল্পে সমাজের প্রান্তিক বর্ণভুক্ত মুচি ও জেলে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দুই বাল্যবন্ধুর সংগ্রামশীল জীবনবৃত্ত বিবৃত হয়েছে গল্পকথকের স্মৃতিচারণাগত পারম্পর্যকে টুকরো টুকরো আখ্যানে উপস্থাপনের সহজাত ভঙ্গিমায়। আপাতসরল অথচ কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতায় জারিত জীবনবোধ তার চেতনায় এ উপলব্ধির জন্ম দেয় — জাতি, বর্ণ ও সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্য আন্তর্মানবিক সম্পর্কগুলোকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সমবায়ে অবমাননাকর পর্যায়ে অবনমিত করে। বাঙালি সমাজে বহুযুগ ধরে পরিচর্চিত বিদ্বেষী মনোভঙ্গিসমূহের বিষবৃক্ষ মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হওয়ার অনিবার্যতাকেই ত্বরান্বিত করে চলেছে। কারণ ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সামাজিক মর্যাদাগত অবস্থানই পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের নিয়ন্তাশক্তি। মুচি ও জেলে জীবনের নির্মম বাস্তবতাকে এ গল্পে নেহাতই গড়পড়তাভাবে মৌল উপজীব্য হিসাবে অবলম্বন করা হয়নি।

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বরং শিক্ষাকে আশ্রয় করে সমাজের প্রান্তবাসী হিসেবে অবজ্ঞাত এ দুই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের প্রতি উচ্চকোটির বাসিন্দাদের নেতিবাচক মনোভঙ্গির স্বরূপ উন্মোচনে লেখক অভিনিবিষ্ট। শিক্ষা ব্যক্তিমাত্রেরই মৌলিক অধিকার, যা থেকে ভারতবর্ষীয় সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণি বহুকাল ধরেই বঞ্চিত হয়েছে। লেখক এ গল্পে অকপটে দেখিয়েছেন — উচ্চ বর্ণভুক্ত মানুষের উক্ত স্বার্থপরায়ণ মনোভাব এখনো সমাজে প্রবলভাবে বিদ্যমান, যার অন্তরালে রয়েছে প্রয়োজনীয় কায়িক শ্রমনির্ভর কর্মোদ্ধারের তাগিদে উক্ত গোষ্ঠীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট পেশায় শৃঙ্খলিত রাখার অপপ্রয়াস। এ গল্পের কথক অশোক মুচির সন্তান। তার পিতা রামদুলাল জাতে মুচি, বর্ণগত পরিচয়ে চতুর্বর্ণ বহির্ভূত, সর্বোপরি অস্পৃশ্য হিসেবে অবনমিত। সে 'করত জুতা সেলাইয়ের কাজ: হাটে বাজারে বসে, অধিকাংশ সময় পাড়ায়-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে' (জলদাস, ২০১২ : ৯)। কিন্তু মুচি হিসেবে প্রতিনিয়ত সমাজের উচ্চ শ্রেণির দ্বারা 'হাটে-মহল্লায় লাথি ঝ্যাঁটা' (জলদাস, ২০১২ : ৯) খাওয়ার তীব্র অন্তর্বেদনায় উদ্ভূত প্রতিশোধস্পৃহাবশত সে স্ত্রীর নিকট কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় নিজের একমাত্র পুত্র অশোকের ভবিষ্যতকে ভিন্নমুখী করার। পক্ষান্তরে মুচিপাড়ার মানুষের চিরাচরিত বংশগত বৃত্তিকে উপেক্ষাপূর্বক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ছেলেকে সাহেব তথা সমাজের বিশিষ্টজনের কাতারভুক্ত হিসেবে রূপান্তরের অভিপ্রায়ই ছিল তার উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বীজমন্ত্র।[৮] পরিবারে স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে কায়ক্লেশে তার জীবন আবর্তিত হলেও জাতিগত পরিচয়ের জন্য বংশ পরম্পরায় অত্যাচারিত হওয়ার বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ করতেই রামদুলাল উক্ত সিদ্ধান্ত নেয়। মুচিপাড়ায় ছেলেমেয়েকে পড়ালেখা শেখানোর রীতি ও সদিচ্ছা বরাবরই উপেক্ষিত। কারণ 'তারা ভাবে — বুড়ো হলে তাদের আশ্রয় দেবে কে, ছাওয়াল শিক্ষিত হলে তো তা করবে না। তাদের পরানে ডর — শিক্ষিত হলে ছেলে মা-বাপকে ফেলে অন্যত্র চলে যাবে। সংসারের প্রয়োজনে আর আগামী দিনের ভয়ে মুচিরা ছাওয়ালদের পড়ায় না' (জলদাস, ২০১২ : ১৩)।[৯] অভাব অনটনের সংসারে রামদুলাল শারীরিক অসুস্থতা ও সাংসারিক ব্যয়ভার অতিক্রম করতে প্রাণান্ত হিমশিম খায়। দিন-রাত অবিরাম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম সত্ত্বেও ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে সে মরীয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্ণবাদী সমাজে 'মুচি-জেলে-মেথর সন্তানদের লেখাপড়া করা কত বড় অপরাধ' (জলদাস, ২০১২ : ১০) তা উপলব্ধি করতে সে সমর্থ হয় অশোককে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক ভবতোষ চক্রবর্তীর অসহিষ্ণু ও প্রতিকূল মনোভঙ্গি অনুধাবনের মাধ্যমে। আট বছর অতিক্রান্ত অশোককে উক্ত শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র হিসেবে ভর্তি করার ক্ষেত্রে প্রথমে সে আপত্তি জানায় — 'এত ছোট ছেলেটারে স্কুলে ভর্তি করিয়ে কী করবি? যা যা নিয়ে যা। আরও একটু বড় হোক। তখন নিয়ে আসিস, তারপর দেখা যাবে' (জলদাস, ২০১২ : ৯)। কিন্তু এ প্রস্তাবে রামদয়াল নমনীয় না হয়ে নিজের অভিলাষ বাস্তবায়নে স্থিত থাকায় তাকে পুনরায় আইনের দোহাই দিতে হয় — 'বললাম তো এ ছোট বাচ্চাকে ভর্তি করানো চলবে না, আইন বিরুদ্ধ' (জলদাস, ২০১২ : ১০)। কিন্তু তার প্রকৃত অভিপ্রায় যে অশোকের বয়সগত আইনি নির্দেশের সঙ্গে নয়, বরং বর্ণগত হীনম্মন্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা প্রতীয়মান হয় ধর্মশিক্ষক মৌলবি আব্দুল হাফিজের সঙ্গে কথোপকথনের ঘটনায় — 'মুচির ছেলে পড়বে! জুতো সেলাই করবে কে?' (জলদাস, ২০১২ : ১০)। অর্থাৎ নিজে পড়ালেখা শিখে সরকারি

চাকরি গ্রহণ করে সমাজের উচ্চ শ্রেণিভুক্ত হলেও ভবতোষ চক্রবর্তীর মতো ব্রাহ্মণরা অশোকের মতো মুচির সন্তানদের উক্ত সুযোগ দিতে অসম্মত। কারণ তেমনটি ঘটলে বিভিন্ন ঘৃণ্য ও অবজ্ঞাসূচক কর্ম সম্পাদনে একপর্যায়ে সমাজের কায়িক শ্রমজীবীদের পাওয়া যাবে না এবং তারাও সমমর্যাদা ও সমঅবস্থানের অধিকারী হবে। অবশেষে ধর্মশিক্ষকের অনুরোধে সে সম্মত হয় অশোককে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করতে, এই ভেবে — সে 'পড়ার ঠেলায় একদিন নিজেই স্কুল ছেড়ে পালাবে' (জলদাস, ২০১২ : ১০)। বিদ্যালয়ের প্রথম দিন থেকেই অশোকের ওপর জারি হয় প্রধান শিক্ষকের অমানবিক ও মর্মপীড়ক নির্দেশ — 'ক্লাসের একেবারে শেষ বেঞ্চে বসবি তুই, খরবদার সামনে বসবার চেষ্টা করবি না কখনো' (জলদাস, ২০১২ : ১০)। অর্থাৎ যে কোনো ভাবে হোক অশোক শিক্ষাজীবনের প্রথম দিন থেকেই শুধু অপমানিত ও প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত নয়, বরং মুচির ছেলে হিসেবে উক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা মানসিকভাবে নিগৃহীতও হয়। বালক বয়সের উক্ত ঘটনাসমূহ তার অবচেতনলোকে যে শিলীভূত ছিল, তার প্রৌঢ় বয়সের কষ্টস্নাত স্মৃতিচারণায় সে সত্য নিগূঢ়ভাবে প্রতিবিম্বিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অশোকের দিনগুলো সঙ্গীহীন হয়ে ওঠেনি। কারণ কয়েক মাসের ব্যবধানে জেলের সন্তান ক্ষীরমোহনকে সে পায় সহপাঠী হিসেবে। তার পারিবারিক বৃত্তান্তও অশোকের মতোই টানাপড়েনে বিপর্যস্ত। ক্ষীরমোহনের পিতা শ্যামচাঁদের সংসারে রয়েছে বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী ও ছোট ভাই গৌরচাঁদ। মুচিপাড়ার পার্শ্ববর্তী জেলেপাড়ার 'সামনের দিকে হেলে পড়া শনের ছাউনির আড়াই কামরা' (জলদাস, ২০১২ : ৯) যা ছিল বরাবরই নোংরা কাদায় প্লাবিত, সেখানেই ছিল তার মাথা গোঁজার নিরবলম্ব আশ্রয়স্থল। স্বভাবে অলস ও বিবেচনাহীন গৌরচাঁদের উদাসীনতা, বৌদি অঞ্জনার তাকে অবাধ প্রশ্রয়দান প্রভৃতি কারণে শ্যামচাঁদকেই পরিবারের যাবতীয় কর্মবোঝা টানতে অহর্নিশ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। ছেলে ক্ষীরমোহন শিক্ষিত হয়ে অনটনের সংসারে হাল ধরবে, হয়ত এরূপ কোনো সংগুপ্ত অভীপ্সাবশতই জেলে হয়েও সে একমাত্র ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠায়। ছাত্র হিসেবে ক্ষীরমোহন যথেষ্ট মেধাবী হলেও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কারণ শ্যামচাঁদের শারীরিক অসুস্থতাগত কারণে তাকেও কখনো কখনো পিতার সঙ্গে মাছ ধরতে ও তা বাজারে বিক্রি করতে হত।[১০] ধর্মশিক্ষক আবুদল হাফিজ ক্ষীরমোহনের অন্তর্লোকে সন্নিহিত লেখাপড়ার আগ্রহকে কৌশলে উস্কে দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রায়শই তার অনুপস্থিতির কারণে সুযোগ পেলেই তিনি ক্ষীরমোহনকে শ্লেষবাণে বিদ্ধ করতেন — 'কীরে অমাবস্যার চাঁদ। কদিন পরে এলি? তোদের মাউচ্ছাদের কে বলেছে পড়ালেখা করতে? যা যা মাছ ধর গিয়া। স্কুলে আসিস না আর' (জলদাস, ২০১২ : ১১)। অথচ পূজার উৎসবে ধর্মশিক্ষকই তাকে নতুন পোশাক উপহার দিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে জানান — 'পাগলারে, তুই যাতে পড়া না থামাইস সেইজইন্য তোরে আঘাত দিতাম। তুই কিছু মনে রাখিস না। ... বার্ষিক পরীক্ষা ভালা গরি দিস' (জলদাস, ২০১২ : ১১)। পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় সে ভালো ফলাফল করলেও সাংসারিক ব্যয়ভার নির্বাহ কঠিনতর হয়ে ওঠায় শ্যামচাঁদ ছেলের পড়ালেখা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। শিক্ষানুরাগী ক্ষীরমোহনের পক্ষে জীবনের নির্মম বাস্তবতা মেনে নেয়া ব্যতীত গত্যন্তর না থাকায় পিতৃআদেশ পালনে সে ছিল অনন্যোপায়।

> বাবা বলে দিছে — আর না। স্কুলে যাওনর দরকার নাই আর। রামায়ণ মহাভারত মনসাপুঁথি পড়তে শিখছস এই-ই যথেষ্ট। জ্যাইল্যার পোলার এর চাইতে বেশি পড়ার দরকার নাই। আমিও আর পারছি না। আমার একজন সহকারী দরকার। ... তুমি আমার লগে দইজ্যাত গেলে আমার শক্তি বাড়বে, সাহব বাড়বে। (জলদাস, ২০১২ : ১৪)।

শ্যামচাঁদ নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সঙ্গে অন্ধ জেদের বশবর্তী হয়েই মূলত ক্ষীরমোহনকে পড়ালেখা করতে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিল। আর্থিক অনটন থেকে মুক্তির বিকল্প অবলম্বন হিসেবে সে ক্ষীরমোহনকে পেশানির্বাহে সহযোগী হিসেবে চায়, যা তার বৃদ্ধ পিতা মেনে নিতে পারেনি। সে ক্ষীরমোহনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, কারণ সমুদ্রে মাছ আহরণ করতে গিয়ে ক্ষীরমোহনের পিতামহ হারিয়েছে তার পিতামহ ও পিতাকে। সেকারণে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে অশোক ক্ষীরমোহনকে সঙ্গী হিসেবে পায়নি। মুচিপাড়ার শিক্ষিত নারীর ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত বাস্তবতা অনুধাবনের ফলে রামমোহন মেয়ে দুলালীকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে অসম্মত ছিল —

> দুলালীকে পড়ানোর দরকার কী? আই.এ, বি.এ পাশ করেও তো মুচির ঘরে গিয়া চুলা ঠেলবো। মুচির ঘরে শিক্ষিত ছেলে কই? আমার মতো জুতা-সিলাইন্যা মুচির সংসারে গিয়া দিনরাত হান্ডি-বাসন মাজতে অইবো। দরকার নাই দুলালীকে পড়ানোর। (জলদাস, ২০১২ : ১২)

বোনের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধের টানে অশোক বাড়িতে তাকে বই পড়া শেখাতে শুরু করলেও দুলালীর ভবিষ্যৎ মুচিপাড়ার নিজস্ব নিয়মানুযায়ী সেই চিরাচরিত পথেই শৃঙ্খলিত হয়। সে-কারণেই শিক্ষিত নারী হিসেবে স্বনির্ভর হওয়ার পরিবর্তে শিক্ষিত যোগ্য পাত্রের অভাবে অশিক্ষিত মুচিকেই স্বামী হিসেবে মেনে নিয়ে সংসারযাপনে বাধ্য হয়। অন্যদিকে পারিবারিক অনটনগত অশান্তি, পিতার অসুস্থতা, দুলালীকে যেনতেনভাবে বিয়ে দিয়ে সংসার করতে পাঠানো প্রভৃতি ঘটনার সম্মিলিত অভিঘাতে অশোকের কিশোর মন বিক্ষুব্ধ হলে কখনো কখনো সে পড়ালেখার প্রতি অনীহ হয়ে উঠত। কিন্তু একপর্যায়ে পুনরায় জ্ঞানজগতে তার প্রত্যাবর্তন ঘটত বিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিনের অনভিপ্রেত সেই চরম অপমানজনক ঘটনায়, অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের তীক্ষ্ণ মর্মভেদী ব্যঙ্গোক্তি স্মরণের মাধ্যমে — 'মুচির ছেলে পড়লে জুতা সেলাই করবে কে' (জলদাস, ২০১২ : ১৩)। উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় অশোক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা পুনরায় বিড়ম্বিত না হলেও এবং এবার পেছনের বেঞ্চে তাকে বসতে না হলেও প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সে অনুধাবনে সমর্থ হয় — মুচির ছেলে হিসেবে সে উচ্চ বর্ণভুক্ত সহপাঠীদের নিকট সর্বদাই অবজ্ঞা ও অবমাননার পাত্র হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।[১১] তাই সহপাঠী হিসেবে তাদের আচরণে সে কখনোই আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবিম্বিত হতে দেখেনি —

> বর্ণবাদী পরিবারের ছেলেরা আমাকে ঘৃণা করত, মুচির ছেলে বলে সত্যি ঘৃণা করত। আনন্দের আতিশয্যে প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। পরে টের পেয়েছিলাম — ওরা আমার সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলে। সহজে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। (জলদাস, ২০১২ : ১৫)

বর্ণবাদের মতো ভয়াবহ অপপ্রথা যে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের চেতনালোককেও কলুষিত করে চলেছে, লেখক উক্ত সমাজসত্য পাঠককে অবহিত করতেই এ বিষয়টির অবতারণা করেছেন। এই অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে অশোক স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছ্বাস ফিরে পায় ক্লাস শুরু হওয়ার তিন মাস পর ক্ষীরমোহনকে পুনরায় সহপাঠী হিসেবে পেয়ে। কোনো কোনো দিন বাসি তরকারি ও পোড়ামরিচ দিয়ে সামান্য পান্তাভাত ভক্ষণ, কখনো বা অনাহারী অবস্থায় হেঁটে এসে টিফিনের পয়সার অভাবে ক্ষুধার্ত পেটেই দুই শিক্ষানুরাগী কিশোরের দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়। অষ্টম শ্রেণি পেরিয়ে নবম শ্রেণিতে নাম নিবন্ধনের সময় রামদুলাল ছেলে অশোকের নামের সঙ্গে পদবি হিসেবে পেশাগত 'দাস' এর পরিবর্তে 'চৌধুরী' সংযুক্ত করতে প্রধানশিক্ষক হিমাদ্রী মজুমদারের নিকট অনুরোধ জানান।[১২] স্বাভাবিকভাবেই এ অনুরোধ বিবেচনায় উক্ত শিক্ষক তীব্র অবজ্ঞা ও শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে ভৎর্সনা করে — 'কানা জাতের নাম পদ্মবংশ। কেন বাপু, এত জাতে উঠার বাসনা কেন' (জলদাস, ২০১২ : ১৭)। এর জবাবে রামদুলালের বক্তব্য —

> মুচি বলে হাটে-মহল্লায় মানুষের লাথি-চড় খেতে হয়। আমি অশিক্ষিত মানুষ ছার, প্রতিবাদ করি না, করতে পারি না। ভাবি — অশিক্ষিত মুচির ভাইগ্য এর চাইতে আর ভাল কতটুকু হবে। কিল খেয়ে কিল হজম করি। ... মুচির ছেলে শিক্ষিত হইয়া চাকরি করবে। জীবনে অনেক ঠেকা আছে অশোকের। পদবির জন্য বারবার লাঞ্ছিত হতে হবে তাকে। অপমানের হাত থেকে বাঁচতে হইলে অশোকের পদবি বদলান দরকার। অশোকের পরে চৌধুরী লিখলে আমার খুশি লাগবে। (জলদাস, ২০১২ : ১৭)

প্রধান শিক্ষক এ ঘটনায় বিস্ময়াভিভূত হলেও অশোককে (জলদাস, ২০১২ : ১৭) 'চৌধুরী' পদবিতেই নিবন্ধনের আদেশ দেয় সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমানের এ পরামর্শে — 'অশোককে গোটাজীবন এর জবাব দিতে হবে। দাসের ছেলে চৌধুরী কেন?' (জলদাস, ২০১২ : ১৮)। শুধু তাই নয়, এরপর তিনি ইচ্ছাপূর্বক ক্লাসে উপস্থিত সকল ছাত্রের সম্মুখে ক্ষীরমোহনকে জিজ্ঞাসা করেন — সে উচ্চ বর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণের জন্য নির্ধারিত পদবিকে নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে পরিচিত হতে আগ্রহী কি না, যা অশোকের জন্য রীতিমত অস্বস্তিকর, পীড়াদায়ক। এ ঘটনার পরবর্তী দিন থেকেই বিদ্যালয়ে ক্ষীরমোহনের অনুপস্থিতি ঘটতে থাকে, এমনকি বাড়ি থেকেও সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অতঃপর সময়ের পালাবদলে অশোক স্কুল, কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বি.এ. পাস করে এবং নরসিংদির বেলাব উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে স্বতন্ত্র সামাজিক পরিচয়। পিতার মৃত্যুর পর সে মায়ের আগ্রহেই দত্ত পদবিধারী[১৩] কুসুমকুমারীকে স্ত্রী হিসেবে অর্জন করে শুধু পিতা রামদয়ালের অনমনীয় জেদ ও আগ্রহের কারণে। এ ঘটনায় স্পষ্টতই নির্দেশিত হয় উক্ত সামাজিক সত্য — বর্ণভুক্ত বাঙালি হিন্দু সমাজে সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীই নিজেদের সামাজিক অবস্থান, পারিবারিক কৌলীন্য ও আভিজাত্য বজায় রাখার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন মর্যাদাসূচক পদবি নামের সঙ্গে সংযুক্ত করত। তবে এ বৃত্তান্ত অন্যেরা অবহিত হলে উক্ত ব্যক্তিকে যে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে, সে সত্য সম্পর্কেও অশোক সচেতন। তাই বোন দুলালী ও তার স্বামী-সন্তানদের আচরণ সম্পর্কে সে বরাবরই উৎকণ্ঠিত থাকে — 'ওদের কথাবার্তা আচার আচরণের ওপর তীক্ষ্ণ নজর

রাখি। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলে বা করে বসে। ওদের মাধ্যমে যদি জানাজানি হয়ে যায় যে আমি মুচির ছেলে। ওরা চলে গেলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি' (জলদাস, ২০১২ : ১৯)।[১৪] সাংসারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অশোকের জীবনে যে রহস্যাবৃত জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল আবর্তিত হয়েছিল প্রিয় বাল্যবন্ধু ক্ষীরমোহনের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার ঘটনায়, নাটকীয়ভাবে এর যবনিকাপাত ঘটে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পিতৃভিটায় তার প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে। একদিন বিকেলে সাহেবিভঙ্গিতে সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণকালে তার সঙ্গে বাল্যবন্ধু ক্ষীরমোহনের আকস্মিকভাবে দেখা হয়। অতঃপর বহুদিনের অকথিত ভাবরাজির আদান-প্রদানের এক পর্যায়ে সে জ্ঞাত হয় — বিদ্যালয় ছেড়ে ক্ষীরমোহন চলে গিয়েছিল নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে। তার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিল 'বেশ্যা'র[১৫] দালালি। এর কারণ হিসেবে সে নিজের মায়ের প্রতি তীব্র বিষোদগার করে। কেননা সেই নারী স্বামীর সংসারে থেকেও দেবর গৌরচাঁদের প্রতি বরাবর আসক্ত ছিল। নিজের মাকে 'বেশ্যা' বিবেচনাপূর্বক সে বেছে নেয় এমন ঘৃণ্য পেশা। মেধাবী কিশোর হিসেবে জীবনের প্রারম্ভ পর্যায়ে সে যে সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছিল, পারিবারিক বিপর্যয় তাকে সে অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে। এর প্রতিকার হিসেবেই সে সান্ত্বনা খুঁজে নেয় 'কোটনা' বা 'বেশ্যার দালাল' পরিচয়ে। সমাজের প্রান্তবাসী দুই ভিন্ন পেশাভুক্ত বাল্যবন্ধুর বিচিত্র চড়াই-উৎড়াইয়ে অতিক্রান্ত জীবনাভিজ্ঞতার নিপুণ রূপায়ণ এ গল্পে এভাবেই ঘটেছে। গল্পপাঠের পরিসমাপ্তি ঘটলে এ বোধ পাঠকের মধ্যে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক — মুচির ছেলে অশোক শিক্ষক হয়ে 'চৌধুরী' পদবি গ্রহণপূর্বক দত্তবাড়ির মেয়েকে বিয়ে করে মনোজগতে সর্বদাই ভীত, নিজের পারিবারিক বৃত্তান্ত অন্যদের নিকট ফাঁস হওয়ার আশঙ্কায়। হিন্দু ও মুসলিম, উভয় সম্প্রদায়ের নিকট মুচির সন্তান হিসেবে সে অচ্ছুত ও অপাংক্তেয় ছিল। তাই অশোকের পিতৃসূত্রে ধারণকৃত পদবির পরিবর্তন সম্পর্কে নঞর্থক ইঙ্গিত ছিল তার বাল্যকালের দুই বিদ্যালয়শিক্ষকের বিদ্বেষী মানসিকতায়। এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয় পদবিকে সামাজিক সুবিধার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারে শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ ও অন্যদের তা থেকে বঞ্চিত রাখার হীনম্মন্য মানসিকতার স্বরূপ। অন্যদিকে জেলের ছেলে হিসেবে ক্ষীরমোহন হয়ত তার মেধা ও শিক্ষার স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হত, যদি পারিবারিক সংকটের অতল চোরাবালিতে নিমজ্জিত না হয়ে উক্ত পরিস্থিতি সামলে নিতে পারত। এটিই জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, যা প্রতিটি মানুষের জীবনপ্রবাহকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে এবং এর নিয়ন্ত্রণ থেকে কোনো মানুষই মুক্ত নয়। পেশা হিসেবে বিভিন্ন কর্ম নির্বাচন — যা কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতার ধারণা। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, শূদ্র ও অস্পৃশ্য[১৬] হিসেবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এসব কর্মে লিপ্ত থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তাই তাদের স্পর্শ ও সান্নিধ্য, ক্ষেত্রেবিশেষে তাদের দর্শনও ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীর নিকট নিষিদ্ধ, অগ্রহণযোগ্য। উপর্যুক্ত ধারণা ও ভাবনা গল্পকথকের অন্তর্লোকেও বিশেষভাবেই প্রবহমান। কারণ উক্ত সংকীর্ণ মানসিকতাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী বহুযুগ ধরে সচেতনভাবে লালন এবং ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিয়ে তা মেনে নিতে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে রীতিমত বাধ্য করেছে —

> ক্ষীরমোহন পাশে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটু কি আঁশটে গন্ধ, পেয়েছিলাম সেদিন, এখন মনে নেই। তবে পরবর্তীতে খেয়াল করেছি — যখনই ক্ষীরমোহন পাশে বসত একটা মেছোগন্ধ আমার নাককে ঘিরে আবর্তিত হত। সেই উৎকট গন্ধ আমার ভেতরের কলকব্জা নাড়িয়ে দিত। ব্যাপারটি আমি কোনোদিন ক্ষীরমোহনকে বলিনি। বলিনি ভয়ে। আমার কথা শুনে সে যদি বলে বসে — আরে তোমার শরীর জামা থেকেও তো চামড়ার বিদ্‌ঘুটে গন্ধ বেরোয়। এই সত্য অথচ অসহনীয় কথার ভয়ে অথবা ক্ষীরমোহনের প্রতি একধরনের মমতা পোষণ করার কারণে মেছোগন্ধের কথাটি তাকে কখনো বলা হয়ে ওঠেনি। (জলদাস, ২০১২ : ১০)

'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন উত্তুঙ্গ পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা জেলেপাড়ার অন্তর্গত হিন্দু মৎস্যজীবীদের ওপর পাক হানাদার ও তাদের দোসর রাজাকারদের হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিকাণ্ডের সমবায়ে ধ্বংসযজ্ঞের নিষ্ঠুর, বর্বর ও কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্ত পরিসরে অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ পেয়েছে।[১৭] প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে জেলেরা যে বরাবরই সমাজের উচ্চশ্রেণির দ্বারা অবহেলিত ও প্রবঞ্চিত, উক্ত জেলেপাড়াটি তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই জেলে বা মাছমারা হিসেবে এতদঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভঙ্গি পোষণে অভ্যস্ত। সামাজিক বিবর্তনের এক পর্যায়ে উচ্চম্মন্য গোষ্ঠীর আরোপিত বিবিধ শাস্ত্রাচার ও অনুশাসনের শৃঙ্খল তাদের অবস্থানকে ক্রমশই সংকুচিত ও অবনমিত করেছে। কায়িক শ্রমজীবী হিসেবে তাদের বরাবরই বঞ্চিত হতে হয়েছে শিক্ষাগ্রহণ ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে। এ গল্পে লেখক জলচারী ধীবরদের নির্মম জীবনসংগ্রামকে চিত্রিত করার পরিবর্তে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদের ওপর ঘনীভূত বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সার্বিক উপস্থাপনায় তন্নিষ্ঠ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরগোবিন্দের জীবনে ধাবমান সংকট ক্রমবিস্তৃত হয় সমুদ্রবক্ষে মৎস্যাহরণের তাগিদে পুত্রদ্বয়কে হারানোর মর্মপীড়ক ঘটনায়। এরই ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ায় পুত্রশোকে স্ত্রীর অকালমৃত্যু ক্রমশই তাকে ভারসাম্যহীন করে তোলে, যার সর্বশেষ পরিণতি হল তার উন্মাদগ্রস্ততা। বেঁচে থাকা একমাত্র কিশোরী কন্যার প্রতি ষাটোর্ধ্ব এই বৃদ্ধের মমত্ববোধ ও পিতৃপ্রতিম ভালোবাসায় কমতি না থাকলেও পারিবারিক সংকট এবং বৈষয়িক সম্পত্তিকে যথাযথভাবে রক্ষা করার অসামর্থ্যগত কারণে সে সকলের নিকট করুণা ও সহানুভূতির পাত্রে পরিণত হয়। তাই তার মেয়েটির লালন-পালনের দায়িত্ব প্রতিবেশী রাধারমণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। একসময় যে সমুদ্র ছিল হরগোবিন্দের জীবন ধারণের পরম সহায়, জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে তা তার বিবেচনায় ক্রমশই চিহ্নিত হয় শত্রুতে। তাই মনোজগতে নিঃসঙ্গ হরগোবিন্দ স্থান-কাল-পাত্র ভুলে নিজের অজান্তেই আকস্মিকভাবে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে — 'দইজ্যারে দইজ্যা তোর লগে আঁর কাইজ্যা' (জলদাস, ২০১২ : ২২)। কখনো কখনো সে সুস্থ-স্বাভাবিক আচরণ করায় তার প্রতি পাড়া-প্রতিবেশীর মমত্ববোধ জাগ্রত হলেও লম্বাটে পেশীবহুল শরীরের 'লম্বা লম্বা উসকোখুসকো চুল, আকামানো দাড়ি, না-মাজা হলুদ হলুদ দাঁত' (জলদাস, ২০১২ : ২২) তার উন্মাদ রূপকে দিয়েছে ভীতিব্যঞ্জক আবহ। অথচ তার মনোলোকের গহীনে যে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের বিবেচনাবোধ অবলুপ্ত হয়নি, সেই পরিচয় পরবর্তীকালে উন্মোচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জেলেপাড়াটি হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ। এর আশে-পাশে কয়েকটি মুসলমান পরিবারের অবস্থান সত্ত্বেও কুলীন হিন্দু পাড়া সচেতন দূরত্ব বজায় রেখে পূর্বদিকে

অবস্থিত। পশ্চিম দিকে স্থাপিত বেড়িবাঁধ ও দক্ষিণ দিকে অবস্থানরত বিরানভূমিতে পাক হানাদার সেনাদের আস্তানা গড়ে ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই উক্ত জেলেপল্লির মানুষের জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে ত্রাস ও আতঙ্কের। তাছাড়া উত্তর দিকে নৌবাহিনী ও পূর্বদিকে বিমান বাহিনীর ঘাঁটিও এই অস্থির পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় এদেশ দখলের আগ্রাসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। সমগ্র দেশের বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর পাকবাহিনীর নিপীড়নের মাত্রা ক্রমশই চরমে ওঠে। প্রাণের ভয়ে অনেকেই স্বদেশের পৈতৃক ভিটাবাড়ির মায়া অগ্রাহ্য করে দেশান্তরী হলেও জেলেপল্লির অধিবাসীরা পিতৃপুরুষের বসতভূমিতেই মাটি আঁকড়ে থেকে যায়। এরই পরিণতিতে তাদের ওপর অচিরে নেমে আসে পাঞ্জাবি-বেলুচি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের নারকীয় অত্যাচার। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট বর্ণনায় পাঠকের মনোলোকে ভেসে ওঠে সেই বর্বরোচিত দৃশ্যাবলি —

> জেলেপাড়ায় দিনে পাঞ্জাবিসৈন্য আসে, বেলুচিসৈন্য আসে। আর আসে রাজাকার। পাড়া বেড় দিয়ে যুবক ও মধ্যবয়সীদের একত্র করে। তাদের দিয়ে বড় বড় গাছ কাটায়, বাঁশ কাটায়। রাজাকাররা মোটা বেতের বাড়ি মারে, রাইফেলের গুঁতো দেয় জেলেদের পিঠে-পাছায়। তাদের দিয়ে কাটা গাছ-বাঁশ বয়ে নিয়ে যায় নিজেদের আস্তানায়। ও-গুলো দিয়ে বাংকার সুরক্ষিত করে।
>
> যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা খালি হাতে যায় না। মধুসূদনের ছাগলটা, মালতির হাঁস চারটি, বুড়া হারানের বাপের প্রসবোন্মুখ গরুটি নিয়ে যায়। জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। শধু মনে আগুন জ্বলে, রাগে-ক্ষোভে শরীর কাঁপে। সেই কাঁপুনি অতি কষ্টে জীর্ণ কাপড়ের নিচে ঢেকে রাখে তারা। ...
>
> দিনে জেলেরা সমুদ্রের কূলে কূলে টাউঙ্গাজাল, হুরিজাল বায়, বেড়িবাঁধ পেরিয়ে সমুদ্রে নামার আগে হানাদাররা নানা প্রশ্ন করে। চড়-থাপ্পড় মারে, লাঠি-বন্দুক দিয়ে গুঁতোগাঁতা দেয়। কাপড় খুলিয়ে হিন্দু না মুসলমান পরীক্ষা করে।
>
> প্রত্যেক পরিবারের সদস্যরা একঘরে জড়ো হয়ে গভীর ত্রাসে রাত কাটায়। সকালে মা-ঠাকুমারা উঠতি বয়সি কন্যা-নাতনিদের মুখে কালিঝুলি মেখে দেয়। মিলিটারি আসছে শুনলে বাড়ির পাশের ঝোপঝাড়ে ওদের লুকিয়ে রাখে। (জলদাস, ২০১২ : ২৪-২৫)

যেহেতু জেলেপল্লিটি হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত, তাই হানাদার বাহিনী রাজাকারদের উস্কানিতে তাদের বিভিন্নভাবে পীড়নের মাধ্যমে ঘৃণ্য সুখ উপভোগের চেষ্টায় মত্ত হয়। এরই সর্বশেষ পদ্ধতি হল নারী ধর্ষণপূর্বক নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস। ষাট বছরের বৃদ্ধ জগমোহন ও তার স্ত্রী তোতারানীর একমাত্র কন্যা ষোড়শী পারুলবালাকে ধর্ষণের পৈশাচিক ঘটনা থেকেই অনুমেয়, পাক হানাদার বাহিনী ও এদেশের ক্রীড়নক রাজাকার পশুরা কতটা অমানবিক হতে পারে। যুদ্ধকালীন সংকটময় পরিস্থিতিতে যেখানে দরিদ্র, প্রতিকারহীন অসহায় জেলেদের পক্ষে শত্রুদের অমানবিক নির্যাতনের কোনোরূপ প্রতিকার অসম্ভব বিবেচিত, সেই বিপন্ন পরিস্থিতিতে আক্রান্ত জেলেদের বিধ্বস্ত করতে একাধিকবার জেলে নারীদের ধর্ষণের ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন দুরূহ নয়। মজিদ রাজাকারের উৎসাহে ক্যাপ্টেন মোর্শেদ তার কামাগ্নি নির্বাপনের শিকার হিসেবে বেছে নেয় পারুলবালাকে। এর প্রতিকারে অসমর্থ জেলেপাড়ার মানুষেরা যাবতীয় বিপন্নতা থেকে

উত্তীর্ণ হওয়ার সর্বশেষ ভরসা হিসেবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়েও অন্তিম পর্যায়ে রক্ষা পায় না। যৌন নির্যাতনের মাধ্যমে নারীত্বের শুচিতা লুণ্ঠিত হওয়ায় পারুলবালা মনোজগতে প্রতিনিয়তই বিপন্ন বোধ করে। এ বর্বরোচিত ঘটনার কোনোরূপ প্রতিকারে তার পিতা জগমোহনের অসহায়ত্ব, পারুলবালার ছোট ভাই কৃষ্ণমোহনের দিশেহারা মনোভঙ্গির সমান্তরালে তোতারানীর অশ্রুসিক্ত বিলাপ সংকটময় পরিস্থিতি থেকে পরিবারটির উত্তরণে কোনো আশাবাদ যোগায় না। সে-কারণেই অসহায়ের শেষ সহায় হিসেবে ভগবানের দ্বারস্থ হতে হয় তোতারানীকে। তথাপি তাদের এ সংকটের প্রতিকার ঘটে না, বরং পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় একই পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত হতে হয়।

> পারুলের মা তোতারানী চাপাস্বরে বিলাপ করছে। দুই হাত দিয়ে মাথায় বুকে চাপড় খেতে খেতে বলছে, 'আই শেষ, আঁরা শেষ। অ ভগমান, তুঁই আঁরার কোয়ালত্ এই কলঙ্ক লেখি রাখ্যিলা দে না? আঁর কুঁয়ারি মাইয়া এখন কড়ে যাইব রে ভগমান! আঁর মাইয়ারে যারা কলঙ্কিত গইয্যে হিতাবার বংশ নির্বংশ অক, তারার মাথাত্ ঠাডাল পড়ক।' (জলদাস, ২০১২ : ২১)

তোতারানীর পারিবারিক সংকটকালীন মুহূর্তে পাড়া-প্রতিবেশী জেলে নারী-পুরুষেরা প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় না। বরং এ ঘটনা পার্শ্ববর্তী হিন্দু ও মুসলমান পাড়ায় প্রকাশিত হলে যে জেলেপাড়া-সম্পৃক্ত অপবাদ আরো বিস্তৃত হবে, এ ভয় দেখিয়ে তাকে প্রশমিত করতে উদ্যোগী হয়। সামাজিক রক্ষণশীলতা ও স্থবিরতা, যুক্তিহীন অনুশাসনের চাপে শৃঙ্খলিত প্রান্তিক মানুষের সমষ্টিচেতনাগত রূপরেখা সম্পর্কে লেখকের সচেতনতার দৃষ্টান্ত উক্ত ঘটনাটি। জেলেপাড়ার সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তিদের পক্ষে এ ঘটনার প্রতিবাদ সম্ভবপর বিবেচিত না হলেও উন্মাদ হরগোবিন্দ লোকমুখে এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তাতে উপলব্ধি করা যায় — তার অবচেতনলোকে হিতাহিত জ্ঞান ও কর্তব্যতাড়না অবলুপ্ত হয়নি। তাই অশ্লীল গালাগালিসূচক ক্রোধমিশ্রিত বাক্য নিক্ষেপই এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে জগমোহনের পরিবার প্রসঙ্গে তার মনোভাব অনুধাবনের মাপকাঠি। পারুলবালাকে ক্যাপ্টেন মোর্শেদের ধর্ষণকেন্দ্রিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সেই অভিশপ্ত রাত পেরিয়ে পরদিন ভোরে জগমোহনের বাড়ির সম্মুখে নির্ঘুম রাত কাটানো ও নিস্পলক দণ্ডায়মান হরগোবিন্দের আচরণের তাৎপর্য অনুধাবনে গ্রামবাসী অচিরেই সমর্থ হয়। বিষয়টি স্পষ্ট হয় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তারই উচ্চারিত সংলাপে সন্নিহিত ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহাগত আক্রোশে। নিজের মাতৃহারা দ্বাদশবর্ষীয় কন্যার সঙ্গে ধর্ষিতা পারুলবালার প্রতিতুলনায় উভয়কেই কন্যা হিসেবে সমীকৃত করার যে স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক আবেগের দুর্বার বহিঃপ্রকাশ তার আচরণে ঘটে, তা নিঃসন্দেহে এ গল্পের মানবিক আবেদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

> দলে দলে জেলেরা আসতে লাগল জগমোহনের বাড়িতে, দইজ্যা বুইজ্যার কাণ্ড দেখতে। ... অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেল রাধাচরণ। বাড়িতে পৌঁছালে তার মেয়েটি বাবার হাত ধরল। হাত ধরতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল দইজ্যা বুইজ্যা। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'পারুলও মাইয়া পোয়া, অঝি তুইও মাইয়া পোয়া। তইলে পারুল মাইনে তুই। পারুলের অপমান মাইনে তোর অপমান। আঁই হউরর পোলা অলরে চাই লইয়ম।' বলতে বলতে দইজ্যা বুইজ্যা একেবারে নীরব হয়ে গেল। (জলদাস, ২০১২ : ২৩-২৪)

যে গভীর আবেগের টানে সে পারুলবালাকে কন্যাসম বিবেচনা করে, তা-ই তাকে উদ্বুদ্ধ করে 'জগমোহনের উঠানের পেটমোটা কাঁঠাল গাছাটির তলায়' (জলদাস, ২০১২ : ২৫) প্রতি সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকতে; যেন পরম মমতায় সে সেই ধর্ষিতা নারীর রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট। শুধু তা-ই নয়, পাক হানাদার বাহিনীকে শায়েস্তা করার সুযোগাকাঙ্ক্ষী হরগোবিন্দের প্রলাপে ক্রমশ স্ফুরিত হয় প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যগ্র প্রতিধ্বনি — 'আঁই চাই লইয়ম' (জলদাস, ২০১২ : ২৫)। পারুলবালাকে ধর্ষণের দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী রাতে হরগোবিন্দের বহু প্রতীক্ষিত দুর্লভ সুযোগ বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা পায় নারীরমণে উন্মত্ত ক্যাপ্টেন মোর্শেদের রাজাকার মজিদ ও তার অনুগত সেনাদের নিয়ে পুনরায় পারুলবালাকে ধর্ষণের লোভে জগমোহনের বাড়িতে হানা দেয়ার ঘটনায়। কাকা রাধামোহনের বাড়িতে প্রাণভয়ে আশ্রিত পারুলবালা সে যাত্রায় হানাদার পশুদের পাশবিক নির্যাতন থেকে রক্ষা পেলেও এবার তার মা তোতারানীর প্রতি তাদের কদর্য দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় অন্ধ উন্মাদনায় অস্থির হরগোবিন্দ ধারালো দায়ের আঘাতে ক্যাপ্টেন মোর্শেদকে হত্যা করলেও এ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে জনৈক পাক সৈন্যের রাইফেলের গুলিতে হরগোবিন্দের মৃত্যুর মাধ্যমে। অতঃপর জেলেপাড়ায় হানাদারদলের অগ্নিসংযোগের ফলে সেখানকার বাসিন্দারা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় অসহায়ভাবে জীবন দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই এ গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্রান্তিলগ্নে পতেঙ্গার জেলেপল্লির নিপীড়িত প্রান্তবাসীর মর্মন্তুদ পরিণতি অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে উন্নীত হয়েছে লেখকের পরিণত, সংযমী ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসিক্ত শিল্পিমনের নিবিড় পরিচর্যায়।

'দুখিনি' গল্পে ভাগ্যবিড়ম্বিত, পরিহাস জর্জরিত জলজীবী মানুষের নিদারুণ অনটনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শোচনীয় অন্তিম পরিণতি বিশ্বস্ত শব্দচিত্রে উত্তীর্ণ। আর্থ-সামাজিকভাবে নিষ্পেষিত ও বিপন্নপ্রায় প্রান্তিক জেলেদের সুদৃঢ় মানসিকতা ও স্বাবলম্বী জীবনভঙ্গি তাদের চারিত্র্যগত প্রবণতা হলেও সুস্থ-স্বাভাবিক দিনযাপনের প্রত্যাশা তাদের নিকট অধরাতুল্যই থেকে যায়। মূলত শিক্ষাগ্রহণের অসামর্থ্য এবং নিম্নতর সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত বংশগত জীবিকা নির্বাহের বাধ্যবাধকতাই তাদের জীবনসংকটকে ত্বরান্বিত করে। কিষ্টপদ-অনন্তবালার দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভ পর্যায়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ছিল সুতীব্র, প্রাণোন্মাদনাপূর্ণ। ছোট-খাটো গড়নের স্বাস্থ্যবতী, মোহিনী নারী অনন্তবালার অনিন্দ্য দেহবল্লরীই কিষ্টপদকে উদ্দীপ্ত করেছিল স্ত্রী হিসেরে নির্বাচনে। শত পরিশ্রম সত্ত্বেও তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল পরিতৃপ্তিকর। নিজের নৌকা-জাল না থাকায় অন্যের নৌকায় দিনমজুরি খেটে কায়ক্লেশে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতে সে ছিল দ্বিধাহীন। এভাবেই দিনাতিপাতের একপর্যায়ে তাদের দুই ছেলে মদনমোহন ও মনমোহনের জন্ম হয়। বড় ছেলে মদনমোহন অন্ধ এবং খোঁড়া। এক পর্যায়ে তাদের সংসারে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে মূলত আর্থিক সংকটকে কেন্দ্র করে। কারণ, কিষ্টপদের দিনমজুরির মাধ্যমে অর্জিত স্বল্প আয়ে সাংসারিক খরচের বন্দোবস্ত ক্রমশই কঠিনতর হয়ে উঠছিল। এরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে প্রথমে তাদের মনোমালিন্য, অতঃপর কলহ-বিবাদ ও অন্তিম পর্যায়ে কিষ্টপদের দৈহিক নির্যাতনে বিক্ষুব্ধ অনন্তবালার স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভঙ্গিতে প্রতিভাত হয় সাংসারিক বিপর্যয়ের স্বরূপ —

অভাবে-দারিদ্র্যে সংসারের আনন্দটুকু মুছে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। স্বামীতে স্ত্রীতে এটা ওটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু হল। মাঝেমধ্যে উভয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হতে লাগল। ঝগড়ার এক পর্যায়ে কিষ্টপদ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অনন্তবালাকে পেটাত। অসহায় বাচ্চা দুটো কিষ্টপদর মারমুখী চেহারা দেখে আর অশ্রাব্য খিস্তিখেউড় শুনে উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদত আর অনন্তবালা বিলাপ ধরত 'এই ভাদাইম্যার হাতত্ পড়ি আঁর জীবননা ছারখার অই গেলগই। অলইক্ষা, ভাত দিত্ নো পারের, কিলাই কিলাই আঁর হাড্ডিগুড্ডি জর জর গরি ফেলাইল রে মা। (জলদাস, ২০১২ : ৪০)

স্ত্রীকে প্রহারের পর পরিশ্রান্ত কিষ্টপদ যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেত, তখন ছোট ছেলে মনমোহন পরম মমতায় তার দুঃখিনী মায়ের কষ্ট ও বেদনা ভুলিয়ে দিতে হাতের তালু দিয়ে চোখের জল মুছে দিত। এভাবেই শৈশবকাল থেকে তার মনোভূমিতে পিতার প্রতি প্রবল বিরাগ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়। দিনমজুরির মাধ্যমে সংসারের ব্যয়ভার মেটাতে হিমশিম খাওয়ায় কিষ্টপদ অবশেষে উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লি ছেড়ে কুমিল্লার জেলেপল্লিতে 'গাউর' বা কামলার বৃত্তি গ্রহণ করে। সেখানে আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত টানা চার মাসের চুক্তিতে মাছ ধরতে সে সম্মত হয়। তবে এতেও তার মতো জেলেদের অবস্থার তেমন উন্নতি সাধিত হয় না। কারণ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের অধিক অর্থ প্রাপ্তিযোগ তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। তাদেরকে প্রতিনিয়তই শোষিত হতে হয় বহদ্দারের অর্থাৎ মাছ আহরণের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতাদানের সংগতিসম্পন্ন মাছব্যবসায়ীর দ্বারা।[১৮] কুমিল্লায় এসে আকস্মিকভাবেই নকুল বহদ্দারের বিধবা কন্যা কেতকিবালার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে তাকে বিয়ে করে। অর্থাৎ স্বামী হিসেবে স্ত্রী ও পুত্রদের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার পিছুটান ছিন্নপূর্বক সাংসারিক দায়িত্ববোধ অস্বীকারার্থে এবং অতীতকে ভুলে যেতেই সে নতুন সংসারে নিমগ্ন হয়। সে-কারণেই চুক্তির নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও সে অনন্ত বালার নিকট প্রত্যাবর্তন করে না। এমনকি অনন্তবালা যখন অহম বিসর্জন দিয়ে যে কোনো মূল্যে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নিজেই উপস্থিত হয় কিষ্টপদের নিকট, তখন তাকে চরমভাবে অপমানিত হতে হয় অশ্লীল বাক্যবাণে। ফলে বাধ্য হয়েই স্বামীকে ছেড়ে দুই ছেলেকে নিয়ে অনন্তবালা নতুনভাবে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়।

প্রথম দু'তিন দিন মুঠিচাল দিয়ে কোনোরকম চালিয়ে ছিল অনন্তবালা। শশাঙ্কদের পুকুর থেকে কলমিশাক তুলে আনল বেশি করে। অনেক শাকের সঙ্গে সামান্য ভাত দিল ছেলেদের পাতে, নিজেও খেল। পরের কদিন পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার উধার করে চলল। শেষে পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালে। কী করবে ভেবে পায় না অনন্তবালা। ছোট ছেলেটি অন্ধ, বড়টি নাবালক। দুটো টাকা কোনো দিক থেকে যে আসবে তার কোনো পথ নেই। অসহায় বিধবা জেলেনিরা মাছ বিয়ারির কাজ করে। বহদ্দারদের কাছ থেকে বাকিতে মাছ কিনে হিন্দু-মুসলমান পাড়ার অলিগলিতে হাঁক দিয়ে দিয়ে বিক্রি করে। লভ্যাংশ দিয়ে কোনরকমে সংসার চালায়। বিয়ারি কাজে শক্তি দরকার। বিশ-পঁচিশ কেজি লইট্যা বা চিক্কা ইটার খাড়াং চৌকো পাতলা তক্তার ওপর বসিয়ে মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিক্রি করা বড়ই কঠিন কাজ। অনন্তবালার ছোটোখাটো ক্ষীণ শরীর। এই শরীর নিয়ে মাছ বিয়ারির কাজ করা সম্ভব নয়। (জলদাস, ২০১২ : ৪১)

অবশেষে নিরুপায় হয়ে সে অন্যের বাড়িতে চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে নিজের ও নাবালক দুই ছেলের ক্ষুন্নিবৃত্তির বন্দোবস্ত করে। সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে এভাবে তাকে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হতে হয়। ইতোমধ্যে মনমোহন চোদ্দ বছর পেরিয়েই সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে হাতেখড়ি নেয়। এক্ষেত্রে তাকেও পিতার মতো অন্যের নৌকায় দিনমজুরির কাজে হাত পাকাতে হয়। এভাবে সাত বছর ধরে বহু কষ্টে জমানো সঞ্চয় দিয়ে সে পূর্ণ বহদ্দারের নিকট থেকে পুরাতন একটি বিহিন্দিজাল কিনে কালাবাঁশির সঙ্গে ভাগাভাগির চুক্তিতে বঙ্গোপসাগর হতে মাছ আহরণ করে। মনমোহনের অর্থোপার্জনের কারণে অনন্তবালা ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করে তার অনুরোধে — 'মা, তুঁই বউত দিন ভিক্ষা গরি গরি আঁরা দুই ভাইয়েরে মানুষ গইয্যো। এখন আঁই কামাইন্যা অই। তুঁই ভিক্ষা গরণ ছাড়ি দও' (জলদাস, ২০১২ : ৪১)। চার বছর পূর্বে অনন্তবালা এক গরিব ঘরের মেয়েকে মনমোহনের পুত্রবধূ করে আনে। সে সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার প্রতিও যত্নশীল। পুত্র ও পুত্রবধূর সংসারে অনন্তবালা জীবনের শেষ দিনগুলো স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করলেও নিঃসঙ্গ চিত্তে প্রায়ই সে স্বামীকেন্দ্রিক স্মৃতিকাতরতায় আক্রান্ত হয়। যৌবনের প্রারম্ভে স্বামীর সঙ্গে প্রেমময় দিনগুলোর কথা ভেবে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলেও অচিরেই তার দুষ্কৃতি অনন্তবালাকে বিষণ্ন করে। লোকমুখে সে নতুন সংসারে কিষ্টপদর বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে অবহিত হয়। সময়ের পরিবর্তনে এখন সে বহদ্দার হিসেবে একটি নৌকা ও চার-পাঁচটি বিহিন্দিজালের মালিক। তিনটি জোয়ান পুত্রকে নিয়ে সে নতুন করে পুনরায় সংসার রচনা করেছে। এসব কথা ভেবে অনন্তবালা নিজের অজান্তেই কিষ্টপদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নিমগ্ন হয় — 'তারও তো যোয়ান দুটো ছেলে আছে। থাক না একটি অন্ধ। সেও ভিটেয় ঘর তুলেছে, এক ছেলেকে বিয়ে করিয়েছে। কিষ্টপদর চেয়ে সে কম কিসে' (জলদাস, ২০১২ : ৪২)। অনন্তবালা ও দুই ছেলের প্রতি কিষ্টপদ নতুন সংসারে কখনোই মমত্ববোধ করেনি। তাই সকল পিছুটানকে সে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যগ্রতায়। মূলত অনন্তবালার প্রতি তীব্র বিরাগ ও ব্যবসায়িক ব্যস্ততা তাকে পুরাতন সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে অনন্তবালা প্রকৃতঅর্থেই স্বামীর প্রতি অনুরাগী বলেই বৃদ্ধাবস্থাতেও তার সম্পর্কে অবগত হতে উৎসুক। স্বামীর প্রতি বাঙালি নারীর অনুসৃত চিরন্তন সংস্কারকে সে স্বেচ্ছায় মেনে চলতে সচেষ্ট। সে-কারণেই 'অনন্ত বালা কিষ্টপদের মতো হতে পারেনি। ওই গ্রামের লোক পেলেই সে কিষ্টপদ সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছে। তবে জেনে খুশি হয়েছে কি বেদনার্ত হয়েছে তার মুখ দেখে তা তখনো বোঝা যায়নি। ভাবলেশহীন মুখমণ্ডলের অন্তরালে সে তার জ্বালাকে লুকিয়ে রেখেছে' (জলদাস, ২০১২ : ৪২)। মনমোহনের মাছ ধরার সঙ্গী হল কালাবাঁশি, যার পারিবারিক অবস্থা মনমোহনের চেয়েও দারিদ্র্যপীড়িত। মাতাহীন সংসারে বৃদ্ধ অথর্ব পিতা ও আট ভাইবোনের জঠরাগ্নি নিবৃত্তির সম্পূর্ণ দায়ভার তার ওপরই ন্যস্ত। সে-কারণেই বিয়ে করে নিজের সংসার গোছানোর ভাবনা তার মনে থাকলেও তা প্রকাশের সুযোগ কালাবাঁশির নেই। একমাত্র বন্ধু মনমোহনের নিকট সে এ অভিলাষ ব্যক্ত করতে সমর্থ হলেও এর বাস্তবায়ন তার নিকট অসম্ভবতুল্যই বিবেচিত। অন্যদিকে মা ও বাবাকে যথাক্রমে হারানো এ দুই যুবকের অন্তর্লোকে সংগুপ্ত বেদনার প্রাবল্য তাদের বন্ধুত্বকে আরো প্রগাঢ় করে তোলে। তাই মাছ ধরার অবসরে নিজেদের সংসারের অতি তুচ্ছ বিষয়ও

একে অন্যের নিকট অবলীলায় প্রকাশ করে। মনমোহনের গর্ভবর্তী স্ত্রী রোহিনীর ডিমওয়ালা রিশশা মাছ ভক্ষণের আগ্রহ সম্পর্কে কালাবাঁশি জানায় — 'ঠিগ আছে, ঠিগ আছে। খাবা খাবা। মনর হাবিলাস নো মিটাইলে আৰার পোয়া অইতো না' (জলদাস, ২০১২ : ৩৮)।

> কালাবাঁশি বিয়ে করেনি। ঘরে তার বৃদ্ধ বাপ জ্ঞানবাঁশি; মা মারা গেছে বহু আগে। সাত-আটজন ভাইবোনে ভর্তি ঘর। তাদের মুখের খাবার যোগাতে জীবন বাজি রেখে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যায় কালাবাঁশি। বাপ উদাসীন, মা নেই বলে এই এত বয়সেও বিয়ে হয়নি তার। ...
> 'তোত্তোন বিয়া গইত্যে মনে নো ক?' জিজ্ঞেস করে মনমোহন।
> 'মনে তো ক। কিন্তুক ক'নে গরাইবো? মা নাই ঘরত॥ বাপর সংসারর ঘানি টাইন্‌তে টাইন্‌তে জীবননান্ গেলগই। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল কালাবাঁশি।
> তুঁই অর আঁই সমান দুখ্যিত্তা। তোর মা নাই আর আঁর বাপ থাইঅ নাই। বলল মনমোহন। (জলদাস, ২০১২ : ৩৯)

চার বছরের দাম্পত্য জীবনে এখনো সন্তানের জন্ম না দেয়ায় মনমোহনের মনোলোকে স্ত্রী সম্পর্কে বিস্তৃত হয় আক্ষেপ ও শূন্যতার হাহাকার। অন্যদিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের কুৎসা-অপবাদের প্রতিক্রিয়ায় অনন্তবালাও তার স্ত্রীর প্রতি ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশে দ্বিধাহীন — 'কী মাইপা বউ গরি ঘরত্ আইন্‌লাম বা-ঝাঁ। আর পোয়ার বংশ শেষ' (জলদাস, ২০১২ : ৩৮)। কিন্তু একথা শুনে এবং অনন্তবালার বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েও সে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেনি। কারণ, কিছুদিন পরই সে স্ত্রীর নিকট থেকে অবহিত হয় তার সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা সম্পর্কে। মনমোহন কালাবাঁশির সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের গহীনে এক সন্ধ্যায় মাছ আহরণ করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কারণ তাদের জীবিকা অসংখ্য প্রতিবন্ধকতায় পরিপূর্ণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত। ফলে যে কোনো মুহূর্তেই ঘটে যায় প্রাণ হারানোর মতো মর্মান্তিক ঘটনা। তাদের জীবনে চরম পরিহাস হল – উক্ত পেশা সম্পৃক্ত এ রূঢ় বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হলেও তা থেকে তাদের পরিত্রাণের সুযোগ নেই। সেই সন্ধ্যায় বঙ্গোপসাগরের খাঁড়িতে অবস্থান করে তারা জাল পেতেছিল জোয়ার নেমে আসার পূর্ব মুহূর্তে। সেখানে তাদের রাত অতিবাহিত করার বাধ্যবাধকতা ছিল। কারণ জোয়ারের প্রাবল্য ও রাতের অন্ধকার অতিক্রম অসম্ভব হওয়ায় তাদের ঘাইয়ে থাকতে (অর্থাৎ লম্বা একটি রশির এক প্রান্তে জাল আর অন্য প্রান্ত নৌকার সঙ্গে বেঁধে সেই রাত সমুদ্রের বুকে কাটাতে) হয়। অধিক মাছ আহরণের তাড়নায় নিজের জীবন বিপন্ন করে এভাবেই জেলেরা প্রতিকূল পরিস্থিতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। অবশেষে রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর যখন তারা নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন আকস্মিকভাবে কালাবাঁশির আর্তনাদে মনমোহন প্রত্যক্ষ করে 'একটা পণ্যবাহী চলন্ত জাহাজ তাদের নৌকার ওপরে উঠে আসছে। জাহাজের পার্শ্বদেশের আঘাতে ততক্ষণে ঘাইয়ের দড়ি ছিঁড়ে গেছে। নৌকার আগায় জাহাজের ধাক্কা খাওয়ার ফলে পাছার দিকে একটা ঘুর্ণির সৃষ্টি হল' (জলদাস, ২০১২ : ৪২)। গভীর সমুদ্রের বুকে এভাবেই সম্ভবত তাদের সলিলসমাধি ঘটে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে পরিবারের স্বজনদের প্রতি গভীরতর ভালোবাসা ও মমত্ববোধের উৎসারণ —

> মনমোহনের কানে কালাবাঁশির কথা ভেসে এল, 'মনমহন্যারে, আঁই ত হেচুঁরিত নো জানি, আঁই ত মইয়্যম, আঁর বাপেরে ইক্কিনি চাইস।' আর কালাবাঁশির কানে এল মনমোহনের আকুতি, 'কালাবাঁশিরে, তুই যদি বাঁচস আর দুখিনি মা উয়ারে চাইস, আঁর অন্ধ ভাইয়েরে সান্ত্বনা দিস। বউয়েরে কইস, আঁর লাই যেএন নো কাঁদে। (জলদাস, ২০১২ : ৪২)

রাতের অন্ধকার পেরিয়ে পরদিন নব প্রভাতে কিষ্টপদ যখন তিন ছেলেকে নিয়ে সমুদ্রবক্ষে মাছ আহরণে ব্যস্ত, তখন আকস্মিকভাবেই মনমোহনের দুই সৎ ভাইয়ের দ্বারা উন্মোচিত হয় তার বেদনাদায়ক মৃত্যুর নাটকীয় বৃত্তান্ত। প্রায় সতেরো-আঠারো বছর পূর্বে পিতা হিসেবে কিষ্টপদ যে সন্তানকে ফেলে চলে এসেছিল এবং অতীতের বৃত্তান্ত নতুন সংসারে ভূমিষ্ঠ তিন ছেলের নিকট গোপন রেখেছিল, অবশেষে জীবনের নিজস্ব নিয়মেই অবারিতভাবে যবনিকাপাত ঘটে সেই সংগুপ্ত অধ্যায়ের। এভাবেই এ গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয় জেলে হিসেবে প্রান্তবাসী মানুষের নির্মম জীবনবাস্তবতা।

'ঢেন্ডেরি' গল্পে প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্বপরায়ণতা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে অবনমিত নারীর প্রান্তিকতা[১৯] সূচিত হয়েছে দাম্পত্য সংকটের সহায়ক ঘটনারাশির সন্নিবেশে। সমাজ নির্ধারিত অনুশাসন ও নৈতিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী কীভাবে ব্যক্তিক প্রণয়াবেগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় স্বেচ্ছাচারী পুরুষের ব্যভিচারী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, তারও রূপরেখা এ গল্পে উপজীব্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ওপর আরোপিত সতীত্বের ধারণা[২০] নিতান্ত-ই যে আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষার হাতিয়ার, তা বলাই বাহুল্য। তবে এ গল্পে উপর্যুক্ত বিষয়টি স্বতন্ত্র মাত্রা অর্জন করেছে জেলেপল্লির মৎস্য শিকারীদের আদিম ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি ও নিয়মকানুন মেনে চলার বাধ্যবাধকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে মান্য করার অভীপ্সায়। শুধু তাই নয়, আরেকটি বিষয় এ গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় উত্তীর্ণ। সেটি হল — চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলবর্তী উত্তর পতেঙ্গার জলজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকা ও বাসস্থানগত বৃত্তান্ত উপস্থাপনে লেখকের পারঙ্গমতা। ছয় পরিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত এ গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট অবস্থানে বসবাস করার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বিশেষ প্রয়োজনে তাদের অন্যত্র বাসস্থান স্থানান্তর ও নতুন সমাজভুক্ত হওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রসঙ্গও নিখুঁতভাবে বয়ানে উৎসাহী। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাইগোপাল জলদাস ও তার স্ত্রী লক্ষ্মীবালা একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত। তার পরিবারে আরো রয়েছে বৃদ্ধ পিতা যদুমোহন ও তার স্ত্রী সুমতি। পরিবার নিয়ে বাঁশখালীর খানকাবাদ থেকে যদুমোহনের উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় বসতি স্থাপনের মূলেও রয়েছে তেমনি এক আখ্যান। উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় বসবাসকারীদের মধ্যে রয়েছে সেখানে বংশানুক্রমিকভাবে অবস্থানকারী এবং অন্য স্থান থেকে বহিরাগত উভয় ধরনের অধিবাসী। মূলত টেকনাফ, সীতাকুণ্ড, সন্দ্বীপ বা হাতিয়ায় জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা তথা খাদ্যাভাব, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা অথবা পাওনাদারের ঋণের বোঝা পরিশোধগত অসামর্থ্যই তাদের প্ররোচিত করে অন্যত্র স্থানান্তরে।

> কখনো প্রকাশ্যে, বেশিরভাগ রাতের আঁধারে নিজেদের আবাল্য জন্মভূমি ত্যাগ করে দূরের কোনো গ্রামে আশ্রয় নেয় তারা। জাল, হান্ডিবাসন, ছাগল, হাঁস-কবুতর, ছালা, কাঁথা-পাটি,

> পিড়া-জলচৌকি নৌকায় ভরে বঙ্গোপসাগরে নৌকা ভাসায় এই স্থানান্তরকামী জেলেরা। পাল খাটিয়ে হাল ধরে বেজার মুখে নৌকা চালায় তারা উদ্দিষ্ট গ্রামের উদ্দেশে। ওই গ্রামের সমুদ্রলগ্ন জেলেপাড়ার কোনো বহদ্দারের বাড়ির পাশের জঙ্গুলে জায়গায় অথবা অস্বাস্থ্যকর ও অস্বস্তিকর ঘাসভূমিতে একটা-দুটো শনের ঘর তোলে। দেশত্যাগী এই জেলেরা সাধারণত কর্মঠ কষ্টসহিষ্ণু হয়। শ্রম-ঘাম ঝরিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তারা বহদ্দার হয়ে ওঠে। ওই পাড়ার কিছু বহদ্দার সর্দার শ্রেণীর লোকের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় তারা গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। কালক্রমে এরা যতই ধনশালী হয়ে উঠুক না কেন, সমাজে তারা সম্মানের আসন পায় না। তারা ওই পাড়ার বহদ্দার হয় ওঠে একসময়, কিন্তু সর্দার হতে পারে না কখনো। ওই পাড়ার সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতেও দূরগ্রাম থেকে আগত জেলেদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। পাড়ায় নিমন্ত্রণ খাইয়ে সর্দারদের বশ করে সমাজভুক্তি পেলেও সমাজমানুষের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান পায় না তারা। (জলদাস, ২০১২ : ৪৬)

উপর্যুক্ত সমাজবাস্তবতা যদুমোহন ও তার পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বহদ্দার হিসেবে যদুমোহনের সহায়-সম্পত্তি ছিল একটি বড় নৌকা, তিনটি বিহিন্দিজাল ও পাঁচটি টংজাল। আকস্মিকভাবেই আষাঢ়ের ঝড়ে নৌকা ভেসে যাওয়ায় তাকে বিপন্ন হতে হয়। কারণ, সঞ্চিত সমুদয় অর্থ ব্যয়পূর্বক সে গহীন সমুদ্রে মৎস্যাহরণের তাগিদে নৌকা ও জালের বন্দোবস্ত করেছিল। অবশেষে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সে ছালাম দাদনদারের নিকট দাদনবাবদ গৃহীত অর্থ-পরিশোধ করলেও সে জানায় — 'টিয়া শোধ নো অয়, আরও পাইয়ম' (জলদাস, ২০১২ : ৪৬)। শুধু তাই নয়, দাবিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য সে প্রতিপালিত গুণ্ডাবাহিনীও লেলিয়ে দেয়। সে-কারণেই প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পরিবারসহ রাতের অন্ধকারে নৌকায় চড়ে উত্তর পতেঙ্গায় স্থানান্তর ব্যতীত তার গত্যন্তর ছিল না। শুধু যদুমোহন নয়, সহায় সম্বলহীন দ্বারকা ও কৃষ্ট পরিবারসহ সেখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দ্বারকাকে বৃদ্ধ মা-বাবা ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ সর্বমোট নয় জনের অন্নের সংস্থান করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই সে 'যেদিন বহদ্দারের জালে যেত, সেদিনই শুধু উনুনে আগুন জ্বলত। না খেয়ে না খেয়ে বৌ-বাচ্চারা কাঠি হতে লাগল। বুড়ো মা-বাবার চোখ কোটরে ঢুকল, চোয়াল ভেসে উঠল' (জলদাস, ২০১২ : ৪৭)। অবশেষে যদুমোহনের আশ্রয়ে তার চলমান সংকট কিছুটা দূরীভূত হয়। কারণ 'স্থানান্তরিত লোকরাই তো বোঝে জন্মভূমি ত্যাগের বেদনা কত গভীর! (জলদাস, ২০১২ : ৪৭ অন্যদিকে কৃষ্টের গ্রাম পরিত্যাগের কারণ ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। 'পূজায় মাত্রাতিরিক্ত দক্ষিণা দাবি করলে বামুনের গায়ে হাত তুলেছিল কৃষ্ট। সমাজপতিরা তাকে একঘরে করল' (জলদাস, ২০১২ : ৪৭)। সমাজারোপিত এ দণ্ডের ভার বহন তার জন্য অত্যন্ত দুরূহ। কারণ 'একঘরে লোকের আগুন পানি বন্ধ। পরিবারের কেউ মরলে শ্মশানসঙ্গী মিলে না, যৌথভাবে সমুদ্রে মাছ ধরার অধিকার থাকে না, সমাজের কোনো নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত হয় না। এ বড় মর্মান্তিক ব্যাপার' (জলদাস, ২০১২ : ৪৭)। এসব বৃত্তান্ত থেকে অনুধাবন সম্ভব, কেন এবং কীভাবে জেলেপাড়ার মানুষকে জীবনসংগ্রামের অন্তর্তাগিদে স্থানান্তরিত হতে হয়। তারপরও যদুমোহনের মতো উদ্যমী ব্যক্তি নতুন পরিবেশেও দুই যুবক পুত্র রাইগোপাল ও রামগোপালের সহায়তায় ক্রমশই আর্থিক সংগতি অর্জনে সমর্থ হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে বয়সের ভারে আক্রান্ত যদুমোহনের কারবার

দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পিত হয় রাইগোপালের ওপর। যুবক রাইগোপালের চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত করতে অচিরেই লক্ষ্মীবালার সঙ্গে তার বিয়ে সংঘটিত হয় পারিবারিকভাবে। শ্যামলা বর্ণের দোহারা গড়নের লক্ষ্মীবালার দৈহিক সৌন্দর্য অসামান্য না হলেও দাম্পত্য জীবনে 'সমুদ্রযোদ্ধা অসুর ধরনের রাইগোপালের চাহিদা মেটাতে সে কখনো পিছপা হয় না। সে সক্ষম ও সক্রিয়। তার সক্ষমতার কাছে একটা সময় রাইগোপাল হার মানতে বাধ্য হয়' (জলদাস, ২০১২ : ৪৮)। সংসারজীবনের প্রারম্ভে পর্যায়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আন্তরিক ও সমঝোতাপূর্ণ হলেও পৈতৃক ব্যবসার বন্দোবস্তগত কর্তৃত্ব আয়ত্তে আসায় অচিরেই তার স্বভাবে পরিস্ফুট হয় বিলাস-ব্যসনে মত্ততা ও পরনারী ভোগের ব্যাকুলতা। বিবাহিত পত্নী লক্ষ্মীবালার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে মথুরার বন্ধ্যা স্ত্রী যৌবনবতী রসবালার প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়। কুঁজো ও স্ত্রীকে পরিতৃপ্তিদানে অক্ষম স্বামীর সঙ্গে প্রণয়হীন সংসারজীবনে বিতৃষ্ণ রসবালার চিত্ত নৈতিক বিবেচনাকে উপেক্ষা করে অতি দ্রুতই রাইগোপালের ব্যভিচারী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় নিজের অবদমিত জৈবিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উদগ্র আকুলতায়। রসবালার দুর্বলতাকে সম্বল করেই রাইগোপাল ধাবিত হয় তার প্রতি। কারণ 'রসবালার রস আছে রসিক নেই। শরীরে দৌলত আছে, লুটে নেয়ার লোক নেই। রসবালার দুটো জিনিস আছে — দারিদ্র্য ও যৌবন। রাইগোপাল রসবালার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে যৌবন চাকবার অধিকার পেল' (জলদাস, ২০১২ : ৪৯)। স্বাভাবিকভাবেই এ পর্যায়ে লক্ষ্মীবালার প্রতি আকর্ষণ হারাতে সে বাধ্য। কারণ নিত্যদিনের দাম্পত্য জীবনের একঘেয়েমি ও গতানুগতিকতা তাকে স্ত্রীর প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীবালার দিক থেকে বিষয়টি চিন্তা করলে, স্বামীর আচরণে বিস্মিত হওয়া তার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। কারণ বিয়ের পর থেকেই রাইগোপাল সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি সত্ত্বেও রাতে বিছানায় শুয়ে স্ত্রীর দৈহিক সান্নিধ্য কামনায় উদগ্রীব থাকত। রসবালার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে অবহিত না হওয়ায় হঠাৎ করেই স্বামীর নিস্তেজ, অনীহ মনোভঙ্গি সম্পর্কে সে ক্রমশ সন্দিহান হয়ে ওঠে। তার এ প্রবণতা আরো জোরালো ভিত্তি পায় লক্ষ্মীবালাকে প্রতারিত করতে রাইগোপালের ঘুমের ভান করে বিছানায় সময় কাটানোর ঘটনায়, কখনো বা ঘাড় ঘুরিয়ে তার প্রতি সতর্ক অথচ গোপন দৃষ্টিপাতের প্রচেষ্টায়।

> লক্ষ্মী রাইগোপালের এরকম আচরণের মর্মার্থ বুঝে উঠতে পারে না। একসময় ভান হাতটা রাইগোপালের গায়ে তুলে দেয় লক্ষ্মী। রাইগোপাল উঁ করে মুখে আওয়াজ তুলে লক্ষ্মীর হাতটি গা থেকে নামিয়ে দেয়। লক্ষ্মী তাকে নিজের দিকে জোর করে টেনে নিতে চাইলে 'বিরক্ত নো গইয্যো' বলে রাইগোপাল কণ্ঠে ঝাঁজ তোলে। (জলদাস, ২০১২ : ৪৯)

একপর্যায়ে হরিদাসীর মা বৈষ্ণবীর মাধ্যমে সে রাইগোপালের সঙ্গে রসবালার পরকীয়া সম্পর্কের ব্যাপারে অবহিত হয়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ক্রোধ, ক্ষোভ ও অপমানবোধের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় তার হৃদয়ভূমি অগ্নিদাহে তপ্ত হয়ে উঠলেও চোখের জলে সে অন্ত রকে প্রশমিত করতে অনাগ্রহী। কারণ তার প্রজ্বলিত চিত্তলোকে স্বামী-সংসারের প্রতি এতদিনের লালিত মমত্ববোধ ও ভালোবাসা আচমকাই দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই নারী হিসেবে লক্ষ্মীবালা বেদনায় প্লাবিত হয়। অথচ শাশুড়ি বা নিকটতম স্বজনের নিকট বিষয়টি অবহিত হয়ে অন্তর্লোকে পুঞ্জীভূত হাহাকার ও

দুঃখবোধকে প্রশমিত করতেও সে অপারগ। কেননা যাকে আশ্রয় করে সে এ সংসারের গৃহবধূ, তার চারিত্রিক স্খলনকে অন্যের নিকট প্রকাশে প্রকৃতপক্ষে তার স্ত্রী হিসেবে লক্ষ্মীবালার নিজেরই অপমান — এমনটি বিবেচনায় সে থাকে স্থিত। অথচ প্রতিটি মুহূর্তে সে অবিরাম লড়াই চালায় উপর্যুক্ত ঘটনা সংঘটনের সম্ভাব্যতা ও এর বাস্তবিক ভিত্তি প্রসঙ্গে। কখনো বা হরিদাসীর মায়ের বক্তব্যকে মিথ্যা হিসেবে বিবেচনা, অতঃপর বিপরীত দিক থেকে যুক্তি উপস্থাপন অর্থাৎ উপর্যুক্ত ঘটনায় তার স্বার্থোদ্ধারের দিকটি অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় লক্ষ্মীবালা আত্মমগ্ন হয়। কেননা, ইতঃপূর্বে স্বামীর কোনো আচরণ বা উচ্চারণে সে পরনারীর প্রতি আসক্তি লক্ষ করেনি। এ পর্যায়ে তার দোলাচল মনোভঙ্গিতেই প্রতিবিম্বিত, স্বামী-সন্তান-সংসারের প্রতি গভীরতর ভালোবাসার অকৃত্রিম উৎসারণ—

> এই যে আমি ... ভেতরে ভেতরে এত কষ্ট পাচ্ছি, কেঁদেকেটে ছেঁড়াভেড়া হচ্ছি, তার আদৌ কোনো কারণ আছে কি? হরিদাসীর মা তো মিথ্যেও বলতে পারে। মিথ্যে বলে হরিদাসীর মায়ের লাভ? স্বামীহীন গৃহহারা বৈষ্ণবী ধরনের এইসব মহিলার মধ্যে কেউ কেউ সাজানো সংসার, বিবাহিত নারীর সুখ দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। ... হরিদাসীর মায়েরও হয়তো সেরকম ঈর্ষা হয়েছে। নইলে কেন যে-স্বামী তার এতই অনুরক্ত ... সে-স্বামীর বিরুদ্ধে নোংরা কথা শুনিয়ে যাবে? ... 'ঝাঁড়া মারি হরিদাসীর মার কোয়ালত' – বলে পাশ ফিরে শোয় লক্ষ্মীবালা। ... আচ্ছা হরিদাসীর মা শুধু শুধু মিথ্যেও বা বলতে যাবে কেন? ... পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? (জলদাস, ২০১২ : ৫২)

তার চেতনালোকে উক্ত ঘটনাকেন্দ্রিক আত্মনিরীক্ষায় পরিদৃষ্টমান বিভিন্ন সম্ভাবনা ও সংশয়ের দোলাচলকে স্পষ্ট করতে স্বামীর আচরণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণপূর্বক সিদ্ধান্তে আসার যে প্রচেষ্টা, তা থেকেই উপলব্ধি করা যায় নারী হিসেবে তার মনোজাগতিক রূপরেখা। উপর্যুক্ত ঘটনার পর দশদিন অতিবাহিত হলেও স্বামীর আচরণে তার প্রতি পূর্ববৎ নীরবতা, উপেক্ষা ও অনাসক্তি পরিলক্ষিত হওয়ায় ক্রমশই হরিদাসীর মায়ের কথাকেই বিশ্বাস করতে সে উদ্বুদ্ধ হয়। এরপরও সে নিজেকে বোঝায় — হয়ত সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের অবসাদে পরিশ্রান্ত বলেই সে লক্ষ্মীবালার প্রতি অমনোযোগী। কিন্তু সেই রাতেই তার সকল সংশয়ের অবসান ঘটে, তাকে ঘুমন্ত ভেবে রাইগোপালের সন্তর্পণে শয্যা পরিত্যাগ করে রসবালার বাড়িতে গমন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে 'আছ না তুঁই? আঁই আস্যি, দরজা খোল' — (জলদাস, ২০১২ : ৫৩) বাক্য নিক্ষেপে। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় লক্ষ্মীবালা রাইগোপালের ব্যভিচারিতায় হতভম্ব হওয়ার পাশাপাশি তার প্রতি এতদিনের লালিত ভালোবাসার অবমাননায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে। স্বামীর প্রত্যাবর্তনে অপেক্ষারত সেই নারী রাতের অন্ধকারে অন্তর্গত বেদনায় যতটা বিক্ষুব্ধ, তার চেয়েও বেশি যন্ত্রণার্ত হয় এভাবে তার নারীসত্তাকে রাইগোপালের মথিত করার হঠকারিতায়।

> লক্ষ্মী ঠায় বসে থাকল বিছানায়। ঘরের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখ দুটো যেন তার আগুনের গোলা। দপ দপ করে জ্বলছে। মাথার দুপাশের রগ দুটো ছিঁড়ে যাবে যাবে। ... ক্রোধ, প্রতিহিংসা, কান্না – এসব মিলেমিশে তার ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে। বিবমিষা জাগছে ... তার একবার মনে হল পিঁড়ি দিয়ে নিজের মাথায় জোরে জোরে বাড়ি খেতে পারলে বুঝি সে শান্তি পাবে। ... আবার লক্ষ্মীর মনে হল – বঁটিটা হাতে তুলে নিতে পারলে তার ভেতরের

> ক্রোধটা কমে আসবে। ... রাইগোপালকে কোপাতে পারলে তার মনটা গভীর তৃপ্তিতে ভরে উঠবে। (জলদাস, ২০১২ : ৫৪)

সেই রাতেই সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশের একপর্যায়ে স্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে রাইগোপালের রসবালাকেন্দ্রিক আচরণের ব্যাপারে নিজস্ব অবস্থানকে স্পষ্ট করার প্রচেষ্টায় অভিব্যক্ত হয় স্ত্রী লক্ষ্মীবালার প্রতি তার সংকীর্ণ ও কদর্য মনোভঙ্গি। যেহেতু পিতার পরিবর্তে এখন সে-ই পরিবারের কর্তা, তাই স্ত্রীর প্রতি যথেচ্ছ আচরণ, স্বেচ্ছাচারিতা ও পরনারী গমনে সে বেপরোয়া। তবে লক্ষ্মীবালাও ব্যক্তিত্বময়ী নারী। তার দাপট ও নির্ভীক উচ্চারণ তাই একপর্যায়ে রাইগোপালকে বাক্‌রহিত করে —

> আঁই খানকি নো, তোঁয়ার বউ। খানকি অইলে বেশ্যাপাড়াত থাইক্‌তাম। বউত্ বেড়া আঁর হঙ্গে ফুইত্তো। তুঁইও যাইতা মাঝে মইধ্যে। ... যে মাইয়া ঘরত জামাই রাখি পরপুরুষের হঙ্গে ফুতে হিতিরেও খানকি ক। আঁই জামাই ছাড়া অন্য বেড়ার হঙ্গে নো ফুতি। ... খানকি আঁই নো, খানকি তুঁই। তুঁই ঘরত্ বউ রাখি অন্য বেডির লগে ফুতো। রাইত্ বিরাইতে মাইনষর ঘরর দরজা ঠেল। (জলদাস, ২০১২ : ৪৪)

পরদিন থেকে যথারীতি সকল সাংসারিক কর্মে ভোর হতে মধ্যরাত পর্যন্ত নিজেকে ব্যস্ত রাখলেও নিঃসঙ্গ চিত্তলোকে সে প্রতিমুহূর্তেই স্বামীর লাম্পট্যজনিত কদর্যতায় বিব্রত, পর্যুদস্ত হয়। কেননা, নারী হিসেবে নিজের সঙ্গে রসবালার প্রতিতুলনায় সে রীতিমত বিস্মিত। সে এই চিন্তায় দিশেহারা — কোন গুণে সে রসবালার চেয়ে তুচ্ছ? কেন সংসারে সবকিছু থাকতেও রাইগোপাল তার প্রতি বিমুখ এবং পরনারী রসবালার প্রতি উন্মুখ। রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান অথবা বিরহকাতরতার প্রাবল্যে তার প্রতি স্বামীকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট লক্ষ্মীবালা অবশেষে নিজের দেহকে অকপটে উন্মোচনপূর্বক রাইগোপালকে সমর্পণ করে। তাতেও উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়ায় অবশেষে সে পারিবারিক মর্যাদা ও সামাজিক প্রতিপত্তির দোহাই দিয়েও ব্যর্থ হয়। কারণ, রাইগোপালের মতো অর্থ-বিত্ত ও বৈভবের অধিকারীর পক্ষে সমাজের কর্তাদের তুষ্ট করা নিতান্তই ছেলেখেলা। সে-কারণেই রসবালার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কগত স্বীকারোক্তিতে সে ক্রমশই হয়ে ওঠে নিঃসংকোচ। অন্যদিকে লক্ষ্মীবালাও অনুধাবনে সমর্থ হয়, 'রাইগোপালকে আর ফিরানো যাবে না। স্বামী তার রসবালার শরীর-শিকল থেকে বেরিয়ে আসবে না' (জলদাস, ২০১২ : ৫৫)। কিন্তু নিজের প্রতি প্রবল আস্থা থাকায় অবশেষে হরিদাসীর মায়ের পরামর্শে সে সমাজপতি গোবিন্দ সর্দারের নিকট যাবতীয় বৃত্তান্ত উপস্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায়ে মথুরার ঘর থেকে রসবালা ও রাইগোপাল একত্রে হাতেনাতে মহল্লাবাসীর নিকট ধরা পড়ে গোবিন্দর আদেশে তার অনুচরদের গুপ্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এর পরিণতিতে জেলেপাড়ার সামাজিক বিধান অনুযায়ী 'সে-রাতে হাতে নাতে ধরা পড়া রাইগোপাল ও রসবালাকে ঢেন্ডেরি দেয়া হল। মাথা মুড়িয়ে জুতার মালা গলায় ঝুলিয়ে পেছন পেছন থালা-কাসা-টিন বাজিয়ে গোটা জেলেপাড়া ঘোরানো হল দু'জনকে' (জলদাস, ২০১২ : ৫৬)। শারীরিক দণ্ড প্রদানের পরিবর্তে আদিম কৌমজীবী সমাজের ঐতিহ্য স্বীকার করে ব্যক্তিক অহমবোধকে শাস্তি প্রদানের দ্বারা সমষ্টিগত মানুষের জন্য সতর্কতাসূচক এ বিধানের রীতি বাস্তবায়িত হওয়ায় অভিযুক্ত নর-নারীর দুষ্কর্ম সর্বসমক্ষে প্রচারিত হয়। তবু এ ঘটনায় লক্ষ্মীবালার প্রান্তিকতার

অবসান আদৌ ঘটে না। কারণ স্ত্রী হিসেবে যে নারী এক পুরুষকে বিয়ের মাধ্যমে স্বামী হিসেবে বরণ করে নতুন জীবন শুরু করেছিল, মৃত্যুর মাধ্যমে তার সংসারপর্বের পরিসমাপ্তি ঘটার পূর্বেই সেই পুরুষ অন্য নারীর নিকট সমর্পিত, এ রূঢ় সত্য মেনে নেয়া লক্ষ্মীবালার নিকট চরম মর্মান্তিক ঘটনা। কিন্তু তা অস্বীকারের সামর্থ্য তার নেই। কেননা বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে রাইগোপালকে রসবালার প্রতি বিমুখ করতে পারেনি। লক্ষ্মীবালার প্রতি রাইগোপালের বিরাগ বা অনীহার পরিণতি নিঃসন্দেহে তাদের দাম্পত্যজীবনের সমাপতন। 'পাড়া ঘুরিয়ে তাদের (রাইগোপাল ও রসবালা) যখন রাইগোপালদের উঠানে আনা হয়, তখন দরজায় খিল লাগিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে যাচ্ছে লক্ষ্মীবালা' (জলদাস, ২০১২ : ৫৬)। স্বামী প্রত্যাখ্যাত এ নারীর কান্না হয়ত ভবিষ্যতে সন্তানকে অবলম্বন করে মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়; কিন্তু বাঙালি সমাজে নারীকে বরাবরই পুরুষের অধীন থাকার যে নেতিবাচক প্রবণতা প্রচলিত, তা মেনে নিলে লক্ষ্মীবালার প্রতি রাইগোপালের বিতৃষ্ণ মানসিকতাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। এরই পরিণতিতে সেই নারীর প্রান্তিকতা চিহ্নিত হয়। কারণ লক্ষ্মীবালার জন্য রাইগোপাল শুধু রসবালাকে হারায় না, সেই সঙ্গে জেলেপল্লিতে প্রতিষ্ঠিত অবস্থান থেকেও বিচ্যুত হয়। সর্বোপরি, বাঁশখালীর খান খানাবাদ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে উত্তর পতেঙ্গায় আশ্রয় লাভে তার প্রচেষ্টাও পুনরায় বিঘ্নিত হয়। কেননা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট 'ভাউস্যা কেউট্যা বা ভাসমান কাঁকড়া' সূচক নেতিবাচক অভিধায় আক্রান্ত রাইগোপালের সর্বস্ব যে নারীর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার নিকট লক্ষ্মীবালার অস্তিত্ব কখনোই মর্যাদাপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে না। লক্ষ্মীবালার প্রান্তিকতাও তাই ভবিষ্যতের পরিসরে যে প্রান্তিকতর হয়ে উঠবে, বাঙালি সমাজের পরিসরে এবং নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের রক্ষণশীল, আগ্রাসী মানসিকতার আলোকে এ ধারণা পোষণ অযৌক্তিক নয়।

'একজন জলদাসীর গল্প'-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন অশান্ত পরিস্থিতির শিকার এক প্রান্তিক, অসহায় গৃহবধূর প্রত্যাশা ও পরিণামের অন্তহীন শূন্যতা, জীবনসংগ্রামে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হওয়ার মর্মন্তুদ বেদনা ভাষ্যরূপ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কারণ স্বাধীন সার্বভৌম দেশে নিজের মতো করে বাঁচার চিরন্তন যে আকুতি মানুষমাত্রেরই পরম প্রত্যাশিত, তার রূপায়ণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্তবে ঘটে সেই সংগ্রামী ও শ্বাসরুদ্ধকর দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে। স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ মানুষের প্রাণের আবেগ, প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসা ও স্বদেশের প্রতি হার্দ্যিক অনুভবের প্রগাঢ়তাই বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছিল এদেশকে পাক হানাদারদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার চরমতম অভিপ্রায়ে। নিঃসন্দেহে এ আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের ঘটনা যুগ যুগ ধরে বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এরই সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে অসংখ্য মানুষের হাহাকার, জীবন-সংগ্রামে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে গিয়ে বিপন্ন হওয়ার নির্মমতা, পাশাপাশি প্রিয়জনের প্রত্যাবর্তনগত অনিঃশেষ প্রত্যাশা। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সরলা জলদাস মুক্তিযোদ্ধা দলের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত জগৎহরি জলদাসের স্ত্রী। তার জীবনবৃত্তের ভাষ্যরূপ পরিক্রমায় লেখক উপর্যুক্ত বক্তব্যকেই রূপায়িত করেছেন। উনিশশ একাত্তর সালের অক্টোবরের এক অন্ধকার রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি

দলের কমান্ডার সেলিম খোন্দকার জগৎহরি জেলের দ্বারস্থ হয় পাকসেনাদের পরাজিত করার অভিপ্রায়ে। কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী কয়লার ডিপোতে আস্তানা স্থাপনকারী শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে জগৎহরির মতো নির্ভীক ও সাহসী ব্যক্তিকেই সেই সংকটজনক পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন — এরূপ বিবেচনা থেকেই তার নিকট কমান্ডার সেলিম উক্ত অনুরোধ জানায়। রাতের অন্ধকারে এই বিপজ্জনক সময়ে স্বামীকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ঘরের বাইরে যেতে দিতে সরলাবালা স্পষ্ট আপত্তি জানায়। কারণ গর্ভবতী সরলাবালা স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিপন্ন বোধ করেছিল। শুধু তাই নয়, এ সংসারে স্বামী ব্যতীত তার নেই কোনো অবলম্বন — যার সাহায্যে সে গর্ভস্থ সন্তান যথাযথভাবে প্রতিপালনের আশ্বাস পেতে পারে। তাছাড়া, স্ত্রী হিসেবে সে স্বামীকে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন করতে অসম্মত ছিল, যা তার ম্রিয়মাণ কণ্ঠে উচ্চারিত শঙ্কায় অভিব্যক্ত — 'আঁই পোয়াতি। ঘরত্ কেউ নাই। তোঁয়ার কিছু হইলে আঁরে চাওইন্যা কেউ নাই। পথের ভিখারি হত্তন পড়িবো। আঁর লগে লগে তোঁয়ার সন্তানও থালা লই অলিতে গলিতে ঘুইরবো' (জলদাস, ২০১২ : ৫৮)। স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর এহেন উচ্চারণে জগৎহরি বিব্রত ও বিচলিত হলেও পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে একবার কমান্ডারের নির্দেশ মান্য করার সুযোগ চায়।[২১] কারণ 'কমান্ডার সাব বারবার অনুরোধ গরের। কুত্তার বাইচ্চা খানসেনা অলে দেশখান ছারখার গরি ফেলার' (জলদাস, ২০১২ : ৫৮)। সরলাবালার সম্মতি জ্ঞাপনের পূর্বেই সে জোরপূর্বক মুক্তিযোদ্ধা দলের সঙ্গে গৃহ পরিত্যাগ করে। স্বদেশের প্রতি তীব্র ভালোবাসাবশত সে এ ক্রান্তিলগ্নে নিজের প্রাণের মায়া, প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি প্রণয়াবেগ ও অনাগত সন্তানের প্রতি পিতৃত্বের পরম মমতা উপেক্ষার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কেননা, জন্মভূমি ও জননী একে অন্যের পরিপূরক। তাই প্রিয়তম স্বদেশ শত্রুসেনার দম্ভময় অস্ত্রসমাগমে অবরুদ্ধ হলে সন্তান হিসেবে তাকে মুক্ত করার দুর্বার অভীপ্সা তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের মতো তার মনোভূমিকেও তীব্রভাবে আলোড়িত করে। ডিসেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হলে জগৎহরির অন্তর্ধানের রহস্য উন্মোচিত হয়। অক্টোবরের সেই অন্ধকার রাতে নদীকূলে ঘাঁটি স্থাপনকারী খানসেনাদের কামানের গোলার আঘাতে তার নৌকাটি কর্ণফুলী নদীতে নিমগ্ন হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র ফজর আলী ব্যতীত সকলেই মৃত্যুবরণ করে। তবে সেও উক্ত আক্রমণে বাম হাত হারায়। প্রাণরক্ষার কৌশল হিসেবে সে রাতের অন্ধকারে নদীতে নিজের শরীরটি জলে কোনোমতে ভাসিয়ে রাখে এবং পরদিন সকালে দাঙ্গাচরের শেখ মোহাম্মদ তাকে উদ্ধার করে। তার নিকট থেকে অন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয় — 'প্রথম গুলিটা সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে, প্রথমে এসে লেগেছিল জগৎহরির বাম চোয়ালে। নিমিষেই বাঁ কান চোখ চোয়াল উড়ে গিয়েছিল তার। হাল ধরে বসেছিল সে। গুলি লাগতেই ঝুপ করে নদীতে পড়ে গিয়েছিল। তারপর জগৎহরির নৌকাটি চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করেছিল। ... তারপর যা হবার তাই হয়েছিল' (জলদাস, ২০১২ : ৫৮)। মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলে স্বামীর প্রত্যাবর্তনে অপেক্ষারত সরলাবালা ফজর আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জগৎহরির মৃত্যুসূচক বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত হয়ে এ ধারণা পোষণ করে — তার স্বামীর মৃত্যু হয়নি বরং সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কারণ 'গুলি লাগার পর আন্নে যদি বাঁচি থাইকত্তে পারেন, তাইলে আর সোয়ামিও বাঁচি আছে' (জলদাস, ২০১২ : ৫৯)। তার গর্ভজাত সন্তান নরহরি ভূমিষ্ঠ

হওয়ার পূর্বেই পিতৃহারা হয়। ফজর আলীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই সরলাবালার আচরণে ক্রমশ ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। সাংসারিক অনটন, শিশুসন্তানের ক্ষুধা নিবৃত্তিগত অসামর্থ্য, ভবিষ্যতের অবলম্বনশূন্য অনিশ্চিত পরিণতি, সর্বোপরি স্বামীর অনুপস্থিতি তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলায় সে স্বাভাবিক বিবেচনাবোধও হারিয়ে ফেলে। তাই নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী সে কখনো রান্না করে, আবার কখনো বা উপোস অনাহারে থাকে। ক্ষুধার্ত শিশু নরহরির কান্না প্রশমন সম্ভব না হলে তাকে নিবৃত্ত করতে সে তাকে রীতিমতো প্রহারেও দ্বিধাহীন। এ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী রামকালির মায়ের অনুগ্রহ ও সহমর্মিতায় কোনোমতে তার দিন অতিক্রান্ত হয়। নরহরি ঘুমালেই সে তাকে একাকী ঘরে রেখে রওনা দেয় কর্ণফুলীর তীরবর্তী মাঝির ঘাটে। নদীর মোহনায় স্থাপিত কয়লার ডিপোর দিকে সে আনমনে তাকিয়ে থাকে। কারণ, অতীতের এক নিঝুম রাতে এ স্থান থেকেই তার স্বামী নৌকা ভাসিয়েছিল। যে বিশ্বাস ও ধারণাকে অবলম্বন করে সে জীবনকে সামনের দিকে অগ্রসর করতে সচেষ্ট — 'একদিন জগৎহরি ফিরে আসবে, দূরবিস্তারী ওই নদীপথ দিয়েই ফিরবে জগৎহরি। না ফিরে জগৎহরির কোনো উপায় নেই। তাকে ফিরতেই হবে। এ কারণে যে জগৎহরি সেদিন কথা দিয়েছিল সে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে (জলদাস, ২০১২ : ৬০)। সরলাবালার এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে স্বামীর প্রতি পরম ভালোবাসাগত নির্ভরতা ও আস্থাবোধ। দাম্পত্য জীবনে সুখী সরলাবালার নিকট স্বামী জগৎহরির ভূমিকা ছিল বিকল্পহীন। এ কারণেই নিজের অবচেতনলোকে সে তার স্বামীর অনুপস্থিতিকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাল্পনিক পরিস্থিতির খসড়া রচনায় নিমগ্ন হয়, যার সঙ্গে মিশে আছে তার প্রত্যাশা ও আবেগের বিচিত্র সংশ্লেষ —

> জগৎহরি এত অবিবেচক নয় যে, স্ত্রী-পুত্রকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিব্যি লুকিয়ে থাকবে। হয়তো দূরে কোথাও ভেসে গেছে জগৎহরি অথবা কোনো কারণে অভিমান করে কিছুদিনের জন্য ভুলে আছে। তার অভিমান ভাঙলে একদিন না একরাত জগৎহরি ফিরে আসবেই এই মাঝির ঘাটে। ঘাটে এসে যদি জগৎহরি দেখে এই রোদজ্বালা দুপুরে বা নদী চুবানো বৃষ্টিতে অথবা কনকনে শীতে সকাল বা দুপুরে বা সন্ধেয় তার বউটি আধো ঘোমটা তুলে তার দিকেই তাকিয়ে আছে, তাহলে কী ভালই না লাগবে জগৎহরির। স্বামীকে এই ভাললাগাটা পাইয়ে দেয়ার জন্যে জগৎহরির বউটি সকাল-দুপুর-সন্ধেয় বৃষ্টিতে বা রোদে ভিজে মাঝির ঘাটের ওই নির্দিষ্ট স্থানে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। (জলদাস, ২০১২ : ৬১)

এভাবেই দিন, মাস গড়িয়ে অতিবাহিত হয় দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর। সময়ের প্রবহমানতায় পনেরো বছরের তরুণী সরলাবালাও উনপঞ্চাশ বছরের জরাজীর্ণ বৃদ্ধায় রূপান্তরিত হয়। তবুও স্বামীর জন্য তার অনিঃশেষ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে না। প্রতিদিন অবিন্যস্ত ও মলিন বেশে, বিস্রস্ত কেশে অগোছালো শাড়িতে আঁচলহীন মাথায় প্রতিমার মতো অনড় ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে থাকে স্বামীর আগমনের অপেক্ষায়। তাকে এভাবে দণ্ডায়মান দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা কোন ধারণা পোষণ করবে, তা ভাববার আগ্রহ বা সচেতনতা সরলাবালার নেই। একমাত্র ছেলে নরহরিকে সে বিয়ে দিতে সমর্থ হয় নিছক প্রতিবেশীদের সহায়তায়। সরলাবালার সাংসারিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত হলেও নরহরির শ্বশুর শ্রীপতি তার সঙ্গে নিজ কন্যা উন্মাদিনীর বিয়ে দিতে সম্মত ছিল জগৎহরিকে মুক্তিযোদ্ধা বিবেচনাবশত শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণের আগ্রহে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাক হানাদারদের

ঘায়েল করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার জন্য সে অকপটে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অকুতোভয় মানসিকতার পরিচয় দেয় মৃত্যুবরণের মাধ্যমে। পৈতৃক পেশাকে বেছে নিয়ে নরহরি সংসারের হাল ধরলেও 'চোখে ছানি নিয়ে, নোংরা ময়লা-যুক্ত হাত-পা ও লম্বা লম্বা নখ নিয়ে জটবাঁধা একমাথা চুল নিয়ে খালি পায়ে সকালে সন্ধেয়' (জলদাস, ২০১২ : ৬৩) 'সরলাবালা জগৎহরির জন্যে যথা-অভ্যাসে মাঝির ঘাটে অপেক্ষা করতে থাকল' (জলদাস, ২০১২ : ৬২)। কিন্তু দিনের পর দিন একনাগাড়ে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকায় এক পর্যায়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ দুই পা ফুলে ওঠায় তার পক্ষে হাঁটা-চলা রীতিমত কষ্টসাধ্য ছিল। শ্যামল ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে সে চৌত্রিশ বছরের গভীরতর বিশ্বাস ও আস্থায় অটল থেকে নদীঘাটে অপেক্ষার প্রহর গুনত। এ সংসারে তার ছিল না কোনোরূপ আসক্তি। স্বামীর জন্য গভীরতর ভালোবাসার একনিষ্ঠা সত্ত্বেও নিজের প্রতি অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যই তাকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। অসুস্থাবস্থায় একমাত্র নাতিকে অবলম্বনপূর্বক সে নদীতীরে গেলেও স্বামীর জন্য তার প্রতীক্ষা রীতিমত বিস্ময়কর। মাঝির ঘাটে দণ্ডায়মান সরলার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসায় নাতির নিকট সেখানে আগত যাত্রীদের উদ্দেশে প্রশ্ন নিক্ষেপ করত 'চাইয়া দেখ ত ভাই, তোর দাদু আইল নাকি' (জলদাস, ২০১২ : ৬৩)। পিতামহীর প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও এর উত্তর দিতে নরহরির ছেলে লেন্ডাইয়া ছিল অসম্মত। কারণ সুদীর্ঘ সময়ে কল্পনার ভুবনে বৃদ্ধার গড়ে তোলা ইমারত ভেঙে দিতে সে চায়নি। কিন্তু একপর্যায়ে সরলাবালার আচরণে বিরক্ত ও অসহিষ্ণু সেই বালক স্পষ্টতই উচ্চারণ করে সেই নির্মম সত্য – 'তোঁয়ার জগৎহরি আর আইতো নো, কোনো দিন আইতো নো। তোঁয়ার নরহরির বাপ মরি গেইয়ে, খানসেনা অলে মারি ফেইল্যে। নদীত্ ভাসি গেইয়ে। হাঙরে কুমিরে খাইয়ে' (জলদাস, ২০১২ : ৬৪)। পাড়ার সকল মানুষ, ঘাটের যাত্রীরা ও লেন্ডাইয়ার মতো সরলাবালাও জানে, তার স্বামী মুক্তিযুদ্ধকালীন এক রাতে নিহত হয়েছে। তথাপি সে সেই সত্যকে অস্বীকার করে স্বামীর প্রত্যাবর্তনগত অলীক কল্পনাব্যঞ্জক প্রত্যাশা গড়ে তুলেছিল। অবশেষে তার পরিসমাপ্তি ঘটে রূঢ় বাস্তবতার নির্মম আঘাতে তা ভেঙে যাওয়ায়। বেঁচে থাকার সর্বশেষ অবলম্বন হারিয়ে নাতির দিকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই সে দুর্বল শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পতিত হয় নদীর ওপর এবং উপুড় হয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে অন্তিম শয্যা গ্রহণ করে। অদৃশ্য স্বামীকে মৃত্যুলগ্নে এভাবে তার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রচেষ্টায় উপলব্ধি করা সম্ভব, অন্তর্গত বিবেচনায় সে জগৎহরির প্রতি কতটা সমর্পিত ছিল। স্বামীকে হারিয়ে তার যে দুর্বিষহ জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল, এতদিনে তার পরিসমাপ্তি ঘটে সরলাবালার মৃত্যুতে। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ অভিঘাত তার মত অনেক নারীকে করেছে বিধবা, স্বজনবঞ্চিত। তেমনি এক জেলে গৃহবধূর জীবনবাস্তবতার রূপায়ণে লেখকের দরদী মনোভঙ্গি এ গল্পে নিপুণভাবে পাঠকের অন্তর্লোককে সিক্ত করে সরলাবালার প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধের একাত্মতায়।

হরিশংকর জলদাসের বিভিন্ন গল্পে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের যে বিশ্বস্ত জীবনচিত্রণ রূপায়িত, তা মূলত লেখকের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতাগত সংশ্লেষণের শব্দচিত্র। জেলের সন্তান হিসেবে কৈবর্ত জাতির ক্রমবিকাশ ও বর্তমানে তাদের সামাজিক অবস্থান তাঁর অন্তর্লোকে কোনোরূপ হীনম্মন্যতাবোধের উদ্ভব

ঘটায়নি। বরং প্রান্তবাসীর প্রতি একাত্মতাবশতই তিনি সাগ্রহে উচ্চবর্গের দ্বারা তাদের বিবিধভাবে নিপীড়িত হওয়ার বৃত্তান্ত পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন। দীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী শূদ্র ও অস্পৃশ্য সম্বোধনপূর্বক তারা অন্তেবাসী হিসেবে নিগৃহীত হলেও সামাজিক গতিশীলতা ও কর্মপ্রবাহে তাদের ভূমিকা যে কোনোভাবেই উপেক্ষার নয়, সেই সত্য উচ্চারণে লেখক নির্ভীক, অকুণ্ঠ। তাঁর গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা এসব মানুষের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে পাঠকের মনোভুবনে নতুন বোধের সঞ্চার ঘটায়।

টীকা

১. 'সাব-অলটার্ন' শব্দটির বাংলা সমার্থক শব্দ হিসেবে কখনো 'প্রান্তজন', কখনো 'নিম্নবর্গ' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। উক্ত শব্দের অর্থগত প্রয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে সামরিক সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতা। সামরিক বাহিনীতে ক্যাপ্টেনের অধস্তন কর্মকর্তা 'সাব-অলটার্ন' হিসেবে অভিহিত হয় [গৌতম ও পার্থ, ২০০৪ : ২]। শব্দটির আভিধানিক ভাষ্য — 'Under the control or influence of some one or something that is more powerful' (জহর, ২০০৭ : ১১)। এরিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রে 'সাব-অলটার্ন' শব্দের অর্থগত ধারণা হল 'এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা অন্য কোনও প্রতিজ্ঞার অধীন, যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়' (গৌতম ও পার্থ, ২০০৪ : ২)। ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির মার্কসীয় চিন্তার বাহন হিসেবে 'সাব-অলটার্ন' শব্দের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামশি নিম্নবর্গ বা 'প্রান্তজনে'র সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা হল 'আধিপত্য' বা 'হেজিমনি'র ধারণা। গ্রামশি প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, নন-হেজিমনিক গোষ্ঠী বা অধীনস্থ গোষ্ঠীই 'প্রান্তজন'। 'সাব-অলটার্ন' শব্দটি গ্রামশি ব্যবহার করেছেন দুটি ক্ষেত্রে। প্রথম অর্থে, এটি সরাসরিভাবেই কার্ল মার্কস কথিত 'প্রলিতারিয়েত'-এর প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাব-অলটার্ন শ্রেণি হল শ্রমিক শ্রেণি, সামাজিক ক্ষমতার বিশেষ প্রক্রিয়ায় যার বিপরীতে রয়েছে হেজিমনিক শ্রেণি বা কার্ল মার্কস কথিত বুর্জোয়া শ্রেণি। এদের পারস্পরিক অবস্থান বিপ্রতীপ ও সাংঘর্ষিক; সে-কারণেই দ্বিতীয় শ্রেণির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণি যুগে যুগে শোষিত হয়। দ্বিতীয় যে অর্থে গ্রামশির লেখায় 'সাব-অলটার্ন' শব্দের ব্যবহার প্রযুক্ত হয়, তা হল — শুধু পুঁজিবাদী সমাজ নয়, বরং শ্রেণিবিভক্ত যে কোনো সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও তিনি 'সাব-অলটার্ন' শ্রেণির কথা বলেছেন। তবে তিনি এখানে স্পষ্টভাবে শিল্প-শ্রমিক শ্রেণিকে নির্দেশ করেননি। বরং যে কোনো শ্রেণিবিভাজিত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে তিনি একটি সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিবেচনা করেছেন। এর এক মেরুতে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আধিপত্যের নিয়ন্ত্রক 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণির বিপ্রতীপ অবস্থানে রয়েছে অধীনস্থ 'সাব-অলটার্ন' শ্রেণি (গৌতম ও পার্থ, ২০০৪ : ৩)। 'প্রান্তজন' সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন গতিপ্রবাহের সৃষ্টি হয় রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে একদল ঐতিহাসিকের সমন্বিত প্রচেষ্টায় — ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ-ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে। রণজিৎ গুহই সর্বপ্রথম 'নিম্নবর্গ' শব্দটি 'Subaltern' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় ব্যবহার করেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার মানদণ্ডে ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীনের যুগ্ম-বৈপরীত্য নির্ণয়ের অনুষঙ্গে প্রান্তজনের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করেছেন। ভারতীয় নিম্নবর্গ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন তাত্ত্বিকের অভিমত অনুযায়ী, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শ্রেণিচেতনা ও আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্কের ভিত্তিতে যাদের প্রান্তজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় —

রণজিৎ গুহ : *গরিব চাষি *প্রায় গরিব ও মাঝারি চাষি *নির্বিত্ত ভূস্বামী *হীনবল গ্রামভদ্র *মাঝারি কৃষক *গরিব শ্রমিক *ক্ষেতমজুর *নিম্নমধ্যবিত্ত *গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা

*আদিবাসী *নিম্নবর্ণ *এমনকি নারীরাও ।

সুমিত সরকার : *আদিবাসী *নিম্নজাতিবর্ণের কৃষি শ্রমিক এবং বর্গাচাষী *বাংলার পদমর্যাদায় মধ্যবর্তী জাতিবর্ণের ভূমির অধিকারী কৃষক এবং এ-স্তরের মুসলমান *শহুরে নৈমিত্তিক শ্রমিকসহ খামার *খনি ও শিল্পশ্রমিক *এছাড়া গরিব কৃষক যে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকরূপে কাজ করে অথবা বর্গাচাষের মাধ্যমে ভূমির অধিকারী হয়।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক : নিরক্ষর কৃষক* আদিবাসী* নিম্নশ্রেণির শহুরে সর্বহারা।

দীপেশ চক্রবর্তী : *ভদ্রলোক পরিবারে গৃহকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি।

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে : *অচ্ছুত *গৃহভৃত্য *নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী *নিম্নশ্রেণি *অভিবাসী * নারী *শিশু এবং অসংখ্য প্রান্তিক অপর।

এতদ্ব্যতীত এগারো খণ্ডের ভারতীয় নিম্নবর্গ গোষ্ঠীর বিভিন্ন গবেষণাকর্মে যেসব প্রান্তজন আত্মপ্রকাশ করেছে, তারা হল — গরিব ও ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষেতমজুর, শিল্পশ্রমিকশ্রেণি, আদিবাসী ভিল, সাহকার ও সাঁওতাল, অন্ত্যজ পেশাদার জননী, দাস, দলিত, কর্মজীবীশ্রেণি, অস্পৃশ্য প্রভৃতি (দ্র. মিল্টন, ২০০৯ : ৮৭)।

২. ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ণব্যবস্থার পরিসরে প্রান্তবাসী হিসেবে সর্বাগ্রে পরিচিত জনগোষ্ঠী হল শূদ্র বর্ণভুক্ত মানুষেরা। *ঋগ্বেদের* 'পুরুষ সূক্ত'সহ অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমূহে ভারতবর্ষীয় মানুষকে দুটি ভাগে বিভাজিত করা হয়েছে। সেখানে আর্য হিসেবে চতুর্বর্ণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দ্বিজ এবং এদেশীয় অনার্যদের শূদ্র হিসেবে সনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে গুণ ও কর্মের ধারণা, অতঃপর জন্মগত অবস্থানকেই চতুর্বর্ণভুক্তির প্রধানতম শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাচীনতম উচ্চারণ রয়েছে *ঋগ্বেদের* দশম মণ্ডলের ৯০তম সূক্তে ('পুরুষ সূক্ত', মানব-স্তোত্র সম্পর্কিত), যেখানে উপর্যুক্ত সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত। *ঋগ্বেদের* কাঠামোবিন্যাস নিরীক্ষা করে ইতিহাসবিদগণ অনুমান করেন, সমগ্র মণ্ডলটিই পরবর্তীকালের সংযোজন। কিন্তু *ঋগ্বেদের* পরবর্তীকালের বৈদিক রচনাসমূহ, মহাকাব্য, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহে সামান্য পরিবর্তন সহযোগে 'পুরুষ সূক্ত' পুনরায় উপস্থাপিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃত।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।
(উদ্ধৃত, হরিশংকর, ২০০৮ : ৫)

ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর চতুর্বর্ণ সম্পর্কিত উক্ত সূক্তের দ্বাদশতম পদের বঙ্গানুবাদ করেছেন এভাবে—

তাঁর (পুরুষ) মুখবিবরে ব্রাহ্মণের জন্ম; তাঁর বাহু থেকে রাজন্য।
উরুদেশ রূপান্তরিত বৈশ্যে আর পদযুগলে জন্ম হলো শূদ্রের।
(ইরফান ও বিজয়, ২০০৬ : ২১)

রামশরণ শর্মা মনে করেন, রচনাকালের দিক থেকে 'পুরুষ সূক্ত' *অথর্ববেদের* কালের শেষদিকে রচিত। তাঁর বিবেচনায়, এটি ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরবর্তীকালে রচিত হওয়াও সম্ভব (রামশরণ, ১৯৯৯ : ৩০)। অন্যদিকে ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর *ঋগ্বেদের* ভাষাগত বিচারে এটি ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রচিত বলে মনে করেন (ইরফান ও বিজয়, ২০০৬ : ২১)। সুস্পষ্টভাবেই *ঋগ্বেদের* অন্তিমলগ্নে আর্য সমাজে রোপিত চার বর্ণের বীজ বৈদিক সমাজে শ্রমের বিভাজনের অগ্রসরতার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কাঠামোতে প্রতিষ্ঠা পায়। *অথর্ববেদ* পর্বের শেষ দিকে কর্ম বিভাজন ক্রমেই রূপান্তরিত হয় সামাজিক স্তর বিভাজনে এবং জনগোষ্ঠী ও পরিবারগোষ্ঠীর পরবর্তী পর্যায়ে অবশেষে সামাজিক শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। স্বভাবতই 'আর্য সমাজের দাস' হিসেবে পরিচিতদের জন্যই নির্দিষ্ট হয় চতুর্থ বর্ণ, যা বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণসম্মত করার জন্যই *ঋগ্বেদের* 'পুরুষ সূক্তে'র অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থের কোনো বিকল্প ছিল না। রামশরণ শর্মা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বাহ্য ও অংশত অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মধ্য দিয়ে আর্য ও অনার্য সাধারণের বৃহৎ অংশকে 'শূদ্র' পর্যায়ে

অবনমিত করা হয়। যেহেতু এই সংঘাত প্রারম্ভে গোধন এবং পরবর্তীকালে ভূমির মালিকানা ও উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের মালিকানাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল; তাই যারা যুদ্ধ-সংঘাতের পরিণতিতে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তারাই নতুন সমাজের চতুর্থ বর্ণ বা শূদ্র বর্ণভুক্ত হয়। এভাবেই আর্যদের সঙ্গে বিবাদ ও পরাজয়ের অনিবার্যতায় দাস, দস্যু ও অনার্যরাও শূদ্র হিসেবে পরিগণিত হয় (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২)। বেদোত্তর কালে শূদ্র বর্ণভুক্তদের অন্যান্য বর্ণের সেবক হিসেবেই ভূমিকা পালন করতে হয়। *জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে, শূদ্রদের উৎপত্তি হয়েছে কোনো দেবতার সাহায্য ব্যতীতই প্রজাপতির পা থেকে। তাই গৃহস্বামীই তার দেবতা এবং তার পা ধুয়েই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন উল্লেখ রয়েছে। শূদ্ররা ছিল শ্রমজীবী শ্রেণি, তাই শ্রমের কাছেই তাদের আত্মনিবেদনে বাধ্য হতে হয়। শুধু তাই নয়, বাধ্যের তালিকায় শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পী ও কারিগরের পাশাপাশি কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য পেশাজীবী গোষ্ঠীকে সংযুক্ত করা হয় (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭)। শূদ্ররা ব্রাহ্মণ্য আচার অর্থাৎ উপনয়ন-সংক্রান্ত সংস্কার থেকে বঞ্চনাপূর্বক বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে উচ্চতর তিন দ্বিজ বর্ণের সেবকে রূপান্তরিত হয় মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের কারণেই। ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের পরিসরে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বৈদিক ধর্ম, শাস্ত্র-সংহিতা ও পুরাণ, স্মৃতিগ্রন্থসমূহ প্রণয়নপূর্বক শূদ্রকে অবনমিত করেছে মানবেতর জীবনযাপনে, গড়ে তুলেছে অন্য বর্ণান্তর্গত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও আদানপ্রদানের ব্যবধানগত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। শুধু তাই নয়, শূদ্র নারীর জন্যও আরোপ করা হয়েছে একই নিষেধাজ্ঞা ও অনুশাসনের শৃঙ্খল। শূদ্র নারীর প্রতি পুরোহিততন্ত্রের ভোগবাদী ও সুবিধাপ্রবণ মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত। বশিষ্ঠের মতে, কৃষ্ণবর্ণা কোনো শূদ্রা রমণীকে ভোগার্থে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে, ধর্মপত্নীরূপে নয় (পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১)। এভাবেই বেদোত্তর যুগে শূদ্ররা সুনির্দিষ্টভাবেই ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে উচ্চবর্গের অধীনস্থ সেবক শ্রেণিতে শৃঙ্খলিত হয়। অথচ এরাই ছিল সমাজের উৎপাদক গোষ্ঠী ও চালিকাশক্তি।

৩. লেখকের অভিমত —

দলিত, বর্ণহীন বর্ণে আমার জন্ম। 'মনুসংহিতা'য় মগ্ন মানুষরা সমাজকে ভাগ করেছে তাদের ইচ্ছে মতো। তাদেরই সৃষ্ট প্রথার কারাগারে বন্দী তথাকথিত নিচুতলার মানুষরা বহু বহুকাল আগে থেকে বঞ্চিত পদদলিত হয়ে আসছে। তো ওই রকম অবহেলিত, পদলাঞ্ছিত সমাজে আমার জন্ম। জন্ম-অপরাধী আমরা। লাথি-চড়ই জুটতে দেখেছি সারাজীবন। অশিক্ষা আর দারিদ্র্যে ভরা সমাজ থেকে উঠে আসা আমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এ জনগোষ্ঠীর জন্য একটা দরদের জায়গা তৈরি হয়। আর আমি যখন লিখতে বসি, তখন ওই দারিদ্র্য-দলিত মানুষরা আমার চোখে আর হৃদয়ে ভর করে। তাদের আমি বেশি করে জানি। ওই জানা আর ভালোবাসা একাকার হয়ে আমার কলম দিয়ে তাদের জীবনকথা বেরিয়ে আসে। (হরিশংকর, ২০১২ক : ৮৫)

৪. তিনি জানিয়েছেন —

আমি যখন আমার ভেতর চোখ রাখি — সমুদ্র দেখি। ... আমার সমুদ্র মানে বঙ্গোপসাগর। ... যার জলে আমি অবগাহন করেছি বা যার জলশস্যে আমার চৌদ্দপুরুষ পালিত হয়েছে, সে বঙ্গোপসাগর। ... আমার বেড়ে ওঠা, আমার জীবনযাপন জুড়ে আছে এই বঙ্গোপসাগর। আজ থেকে আশি বছর আগে এই বঙ্গোপসাগরই আমার দাদুকে কেড়ে নিয়েছিল। ... বাপের অপমৃত্যুতে ভড়কে যাননি চন্দ্রমণির ছেলে যুধিষ্ঠির। তরুণ যুধিষ্ঠিরও একগাছি নৌকার পাছায় শক্তমুঠিতে হালধরে বসেছেন। ... আমি চন্দ্রমণির তৃতীয় পুরুষ, বঙ্গোপসাগরে নৌকা না ভাসিয়ে পারিনি। পরিবার-পরিজন এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাকেও কাল-বৈশাখিকে মাথায় নিয়ে, আষাঢ়-শ্রাবণের ঝড়-জলকে উপেক্ষা করে কখনো বাবার সাথে কখনো বা গাউর কামলাদের সাথে মাছ মারতে গেছি (!) বঙ্গোপসাগরে। ... ঝড়জলের আঘাতে নৌকার গুড়ি ভেঙেছে, পাল ছিঁড়েছে, দাড় ভেসে গেছে। কিন্তু আমরা হার মানিনি। জানি — হার মানলে মৃত্যু

অবধারিত, হার মানলে উনুনে আগুন জ্বলবে না, মা-বাবা পরিজন না খেয়ে মরবে। এজন্য আমরা আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত দিতে শিখেছি। তাই নৌকাকে ঢেউ-ঝড়ের প্রতিকূলে সমুদ্রে পাতানো জালের কাছে নিয়ে গেছি। জলশস্য নৌকায় তুলে বিজয়ীর বেশে বাড়ি ফিরেছি। ... শুনেছি — জীবন ঘষে ঘষে নাকি আগুন জ্বালানো যায়। ওই ত্রিশ বছর সমুদ্রজীবনে আমি জীবনবাজি রেখে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তার একেবারে জলাঞ্জলি হয়নি। যখন আমি লিখতে বসলাম, ওই ঝড়জলের অভিজ্ঞতা, ওই মাছমারার অভিজ্ঞতা, ওই রুক্ষ-রুদ্র ভয়ংকর সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগল। ... সমুদ্র আমার অস্তিত্ব, আমার বিকাশ-বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্র। ... এখনও সুযোগ পেলে আমি পতেঙ্গার সমুদ্রচরে গিয়ে বসি। জেলেপাড়ার মানুষরা আমাকে ঘিরেবেড়ে বসে। থাকে তরুণরা, থাকে সমুদ্রে স্বামী-হারানো বিধবারা, আর থাকেন বয়োবৃদ্ধরা। ... বয়োবৃদ্ধরা তাঁদের সমুদ্রাভিযানের গল্প শুনান, বিধবারা তাদের স্বামীহারানোর বেদনার কথা আমার সামনে খুলেমেলে ধরে। ... আমার চেতনার প্রধান অনুষঙ্গ সমুদ্র। সমুদ্র আমার স্মৃতির সরোবর পূর্ণ করে, আমার সাহিত্যকে পত্রবহুল করে। (হরিশংকর, ২০১২ক : ১৪-১৯)

৫. তাঁর স্বীকারোক্তি —

ক. মানুষই আমার লেখার মূল প্রেরণা ও অনুষঙ্গ। ভদ্র ও শিক্ষিতজনদের নিয়ে আমি তেমন লেখালেখি করি না। সাধাণ মানুষ, অবহেলিত মানুষ, নিত্যদিন লাথিঝাঁটা খাওয়া মানুষগুলোর জীবনকথা আমার লেখায় বারবার উঠে আসে। ওই কিল-ঘুষি-লাথি-ঝাঁটা খাওয়া মানুষ আমিও। আমি যে সমাজে জন্মেছি, তারাও। ওদের আমি ভালো করে চিনি। তাই ওদের নিয়ে লিখি। তাদের কম পেয়ে বেশি উল্লাস করার কথা, না পেয়ে নীরব থাকার কথাও আমার লেখার বিষয়-আশয় হয়। সাধারণ মানুষের হিংসা-রিরংসা, ভালোবাসা-দুর্গতি, অপ্রাপ্তি-উল্লাস এসব বিষয় আমার লেখায় প্রাধান্য পায়। (হরিশংকর, ২০১২ক : ৭৩)

খ. দলিত জীবনে জন্ম আমার, বর্ণবিন্যাসের বিচারে নমঃশূদ্র যাদের বলে। তো কলম ধরলে তো ওদের জন্যই ধরব। ধনী, ভদ্র-শিক্ষিতদের নিয়ে লেখার জন্য অনেকে আছেন। মেথর, জেলে, মুচি, বেশ্যাদের নিয়ে লেখার কেউ নেই বলেই ব্রাত্যশ্রেণি নিয়ে আমার লেখালেখি। (হরিশংকর, ২০১২ক : ৮৯-৯০)

৬. লেখক জানিয়েছেন —

জীবন থেকে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় খসে গেল। বর্ণহীন জীবন, ঘামে ভেজা জীবন। অর্ধ শতাব্দীর ত্রিশটি বছর সমুদ্র-সংগ্রামে কেটেছে, গায়ে নোনাজলের গন্ধ, হাতের তালু কিনাঙ্কর্কঠিন। মাছের ভার বইতে বইতে দুকাঁধে গোদ। সামনে শাকান্ন। ধৃত বড় মাছ খাবার অধিকার নেই, ওই মাছ খেলে যে উনুন জ্বলবে না। পরে সরকারি চাকরি, কলেজের অধ্যাপনা। জীবনের গোটাটা পথ বুক ঘষে অতিক্রম করা। চুয়াল্লিশ বছর পেরিয়ে, হঠাৎ কলম হাতে তুলে নেয়া, লিখতে বসা। নিচুতলার মানুষদের জীবনকথা শুনিয়ে যাওয়া। জীবনের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা-অদেখা মানুষের জীবনকাহিনি শব্দের পিঠে শব্দ জুড়ে বুনে যাওয়া। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ঘেরা পরিবেশে যে-জীবনের সূচনা, আজ তা উজ্জ্বল আলোতে দ্যুতিময়। এই জীবনে আলো যেমন আছে, আঁধারও আছে, প্রেম যেমন আছে, বিরহও আছে। জীবনের কোনো কোনো সময়ের স্মৃতি এখনও আমাকে বিপন্ন করে, লজ্জার অতল তলে আমাকে ঠেলে দেয়, বেদনার দুর্মর পেষণে আমি পিষ্ট হতে থাকি। (হরিশংকর, ২০১২ক : ৭৯)

৭. হরিশংকর জলদাস উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন —

'জলদাসীর গল্প' একটু ভিন্নধারার বই। এখানেও জেলেজীবন বর্ণিত। এ গ্রন্থের দশটি গল্পের কেন্দ্রচরিত্র দশ জন জেলেনারী। তাদের দহন-বিরহ, তাদের পরকীয়া, ধর্ষণ, তাদের যাতনা-উল্লাস, তাদের লোভ-লালসা-হাহাকার এই গল্পগুলোর উপকরণ-অনুষঙ্গ হয়েছে। ... আমি যা জানি, তা লিখি। ফলে আমার লেখায় আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন বারবার ফিরে এসেছে; তবে তা ভিন্ন আঙ্গিকে বৈচিত্র্যময় হয়ে। (হরিশংকর, ২০১২ক : ৮৯)

৮. লেখক জানিয়েছেন —

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নটাই আমার বাবার ভেতরে আগুন জ্বালিয়েছিল। কোনো এক বর্ষায় সমুদ্রে বাবাকে হারিয়ে তিনি সমুদ্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই শৈশব থেকে সমুদ্রকে তিনি অশ্রদ্ধা করে এসেছেন, কিন্তু অস্বীকার করতে পারেননি। পেটের তাগিদে, পরিবারবর্গকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ভালো না-লাগা সমুদ্রের কাছেই হাত পাততে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি অর্থাৎ আমাকে তিনি সমুদ্রসান্নিধ্য থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। তাঁর ভেতরের অসম্পূর্ণতাকে তিনি আমার মধ্যে পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। আমার স্বল্পশিক্ষিত বাবা সমুদ্রকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন আমাকে শিক্ষিত করে। অন্যান্য মৎস্যজীবী যখন তাদের ছেলেদেরকে মা-গঙ্গার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, তখন আমার বাবা আমাকে মা সরস্বতীর হাতে জমা দিয়েছেন। ... বাবাকে সাহায্য করার জন্যে আমারও সমুদ্রে যাওয়া শুরু হলো। কখনো অধ্যয়নের সাথে সমঝোতা করে, কখনো বা বিদ্যার্জনকে অবহেলা করে আমার সমুদ্রযাত্রা অব্যাহত রইলো। সেই ১৩/১৪ বছর বয়স থেকেই সমুদ্রের সঙ্গে আমার যুদ্ধ শুরু। কখনো সমুদ্রে ডুবে, কখনো বর্ষার ঝড়-তুফানে ভেসে গিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, পরিবারবর্গের অন্নসংস্থানের জন্যে বাবার সহকারী থেকে সহযোগী হয়েছি। তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমার এই সমুদ্র-সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। (হরিশংকর, ২০১১ : ৫৫-৫৭)

৯. হরিশংকর জলদাস জানিয়েছেন —

রামপালের হাতে পরাস্ত কৈবর্তরা সেই যে কোণঠাসা হয়ে পড়লো, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো, আজ পর্যন্ত গা থেকে ধূলি ঝেড়ে সম্মিলিতভাবে আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না। যুগ-যুগান্তর ধরে দুরাচারী বর্ণবাদীদের দ্বারা তারা নিপীড়িত হতে থাকলো, ধনলিপ্সু মৎস্যজীবীদের হাতে মাছ ধরার ব্যবসা হারালো, রাজনীতিকদের হাতে পুতুলের মতো ব্যবহৃত হতে থাকলো। মাছ ধরার উপকরণ হারিয়ে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মাছ মারার অধিকার হারিয়ে, মাছ মারার ক্ষেত্র হারিয়ে কৈবর্তরা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। কী এক দুর্বোধ্য কারণে শিক্ষা এই সমাজে কোনো কালে মর্যাদা পায়নি। কথায় বলে – মানুষ দেখে শেখে, কিন্তু এই কথাটি শিক্ষার বেলায় জেলেদের জন্য প্রযোজ্য নয়। পার্শ্ববর্তী হিন্দু-মুসলিম সমাজের সন্তানরা স্কুল-কলেজ যাচ্ছে, শিক্ষার স্পর্শে এই দুই সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে জেলেসমাজ নির্বিকার। শিক্ষায় আলো আছে, অর্থনৈতিক দুর্বিষহতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষাগ্রহণ। এই ব্যাপারটি জেলেরা দেখে শিখতে নারাজ। তাদের বিশ্বাস — শিক্ষা নিকট আত্মীয়কে দূরে সরিয়ে দেয়, আপনকে পর করে ছাড়ে। (হরিশংকর, ২০১১ : ৬৫)

১০. হরিশংকর জলদাস জানিয়েছেন —

জেলে বালকরা ১৩/১৪ বছর বয়স থেকে মাছ-জাল-নৌকা-মাছমারা-মাছবেচা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। আর একটু বয়স হলে সমুদ্র বা নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া শুরু করে। কখনো বাপের সঙ্গে, কখনো বড় ভাই বা কোনো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে, আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গাউর (কামলা) হিসেবে অন্যজনের নৌকায় করে তাদের শিকারজীবন শুরু হয়। এই জীবন কষ্টকর, শ্রমসংকুল, বিষাদময়, গালিবহুল, শিক্ষানবিস বলে নৌকার অন্যান্য দক্ষ গাউরদের ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতে তার প্রাণান্ত হয়। দড়ি-দড়া-পাল-নোঙর গোছগাছ করা দাড়-হড়ই গুছিয়ে রাখা, কাঁইক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সবই তার দায়িত্ব। অদক্ষ বলে, শারীরিকভাবে দুর্বল বলে এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে প্রায়ই ভুল করে। এই ভুলের মাশুল দিতে হয় তাকে। কাজে ভুল করলে বা শারীরিক শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে না পারলে তার উপর বর্ষিত হয় নানা গালিগালাজ। ... এই মর্মান্তিক গালি নবিশকে ক্লান্ত করে, বিপর্যস্ত করে। তার মন বিষাদে ভরে যায়। তারপরও সবকিছু মুখ চোখ বুজে সহ্য করে সে। কারণ সে তো পরিবারের উপার্জনশীল, হয়তো একমাত্র উপার্জনশীল। তার দিকে হা-করে চেয়ে আছে পরিবারের ৫/৭ জন বুভুক্ষু মানুষ। (হরিশংকর, ২০১১ : ৫৯)

১১. লেখকের বক্তব্য —

১৯৬৬-এর জানুয়ারির মধ্যভাগে আমাদের ক্লাস (ষষ্ঠ শ্রেণিতে) শুরু হল। স্কুলটা ছিল কিম্ভূতকিমাকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিলিটারিদের পরিত্যক্ত সিনেমা হল অথবা ডাইনিং হল অথবা অস্ত্রের গোডাউন যাই হোক না কেন, তাতেই আমাদের ক্লাস হতো। চার দেয়ালের টিন-সেইডের একটা বড় হলঘর ছিল সেটি। ... বেড়ায় ঘেরা উত্তরদিকের অনালোকিত একটি কক্ষে আমাদের ক্লাস শুরু হল। নানা পোশাকের, নানা বনেদি-চেহারার বহু ছাত্র গোটা কক্ষটিকে মুখরিত করে রেখেছে। আমিই একমাত্র জলপুত্র যে এই শ্রেণীতে পড়ার দুঃসাহস নিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। জড়সড় হয়ে কক্ষের এককোণে বসে আছি। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে পুরনো ছেঁড়াকোড়া জামাটামা হবে বোধ হয় একটা। ... শিক্ষক যখন 'হরিশংকর জলদাস' নামটি উচ্চারণ করলেন, তখন ক্লাসে হাসির একটা রোল পড়ে গেল। সে হাসি ঠাট্টার, সে হাসি ধিক্কারের। পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল 'ডোম! ডোম!' সেই দিন আমি প্রথম জানলাম – জলদাস মানে ডোম, জেলে মানে আসির খোরাক যোগানো ক্লাউন। (হরিশংকর, ২০১১ : ২২-২৩)

১২. লেখকের অভিমত —

জেলেরা আজ তাদের পদবি বদলে ফেলছে। 'জলদাস' পদবি ত্যাগ করে চট্টগ্রামের অধিকাংশ জেলে তাদের নামের শেষে 'দাশ' লিখতে শুরু করেছে। শিক্ষিত জেলেরা স্কুলে ভর্তি করানোর সময় তাদের সন্তানদের নামের শেষে 'রায়', 'সেন', 'দাশগুপ্ত', 'চৌধুরী' প্রভৃতি পদবি যুক্ত করে দিচ্ছে। সামাজিক নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে, হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তারা এই লুকোচুরির আশ্রয় নিচ্ছে। ... জেলেসন্তান হিসেবে পরিচয় পেলে স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও সহপাঠীরা নানাভাবে বিপন্ন-বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে, তার মধ্যে মানসিক নির্যাতন প্রধান। জেলেরা আজ 'ডোম' নামে অভিহিত হচ্ছে। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের কোণঠাসা করে রাখার প্রবণতা আজও বর্ণবাদী সমাজে সগর্বে বিরাজমান। এ সকল বিপর্যয়-বিষণ্ণতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে জেলেরা আজ পদবির ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করছে. করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু কোনোভাবে এই মেকি-পুচ্ছ ধারণের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়লে তারা নানা রকম মর্মঘাতী উপহাসের সম্মুখীন হচ্ছে। ... জেলেরা আজও শিক্ষাবঞ্চিত এবং কৌলীন্যবাদীদের নিন্দনীয়। এর জন্যে জেলেরা দায়ী নয় কোনোভাবেই। দায়ী সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, দায়ী বহুকাল পূর্ব থেকে বহমান সামাজিক প্রথা-সংস্কার। কিন্তু যে ধিক্কারের জন্যে তারা নিজেরা দায়ী, তাহলো — স্বকৃত পদবি-বিসর্জন। (হরিশংকর, ২০১১ : 'ভূমিকা')

১৩. লেখকের অভিমত —

আজকালকার জেলেসমাজে যে দু'একজন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, তাদের অধিকাংশই মা-বাবা-ভাই-বোনদের ত্যাগ করে শহরবাসী হচ্ছে। স্ব-সম্প্রদায়ের অল্পশিক্ষিত মেয়েকে এরা বিয়ে করতে নারাজ। এরা বিয়ে করছে বর্ণহিন্দু সমাজের কোনো উচ্চশিক্ষিত কন্যাকে। বিয়ের আগেই এই শিক্ষিত জেলেরা তাদের সম্প্রদায়গত পদবি ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। গ্রহণ করছে চৌধুরী, সেন, রায়, দত্ত, নিদেনপক্ষে দাশ পদবি। বংশ পরম্পরাগত পদবিতে তাদের যত অস্বস্তি! তারা মনে করে বর্ণচোরার সকল স্তুতি লুকিয়ে আছে সেন, দত্ত, রায়, দাশ প্রভৃতি পদবিতে। ... তারা জানে না, তাদের এই বর্ণচোরা মনোবৃত্তি দেখে অন্যরা হাসে, টিটকারি দেয়। (হরিশংকর, ২০১১ : ৬৫)

১৪. অশোক সুবিধবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে একাত্মতাবশত পদবি পরিবর্তন করে প্রতিনিয়ত হীনম্মন্যতাগত দোদুল্যমানতায় আক্রান্ত হলেও লেখকের নিকট বিষয়টি সমর্থন পায়নি। তাই তিনি নিজে 'জলদাস' হয়েও যে ভদ্রসমাজের সমীহ আদায়ে সমর্থ হন, তার অন্তঃর্প্রেরণা হল নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তি, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে পরিবার ও স্বীয় জাতির প্রতি লেখকের প্রগাঢ় ভালোবাসা – 'আমি পরবর্তী জন্মেও জেলের ঘরে জন্মাতে চাই। যে অর্ধশিক্ষিত জেলে-দম্পতি নিজের ঘরের টিন বিক্রি করে ছেলের পরীক্ষার ফি দেয়, যে অশিক্ষিত দাদিমা ঝড়জলের গভীর রাতে নাতিকে হারিকেনের কর্দমাক্ত পথ দেখাতে দেখাতে ... কালো মাটির জেলেপল্লীতে নিয়ে আসে, যে

জেলেপল্লীতে সহোদররা অর্ধপথে নিজেদের পড়া থামিয়ে দাদার পড়ার সুযোগ করে দেয়, সেই সমাজে আমি বারবার জন্মাতে চাই। 'জলদাস' পদবির তিলকটি মাথায় ধারণ করে ধন্য হতে চাই।' (হরিশংকর, ২০১১ : ৫৩)

১৫. পৃথিবীর আদিমতম পেশা হিসেবে সমগ্র বিশ্বেই পতিতাবৃত্তির অস্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে এর বিস্তারের অন্তরালে রয়েছে নারীর প্রতি পুরুষের ভোগবাদী, আধিপত্যপ্রবণ ও নিয়ন্ত্রণকামী মনোভঙ্গি। সমাজ ও সংসারের কর্তা হিসেবে পুরুষ বরাবরই চেয়েছে নারীকে নিজের আয়ত্তে রাখতে, অন্যের সান্নিধ্য থেকে তাকে নির্বাসিত করতে এবং যে কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মতোই বিয়ের মাধ্যমে তার ওপর সর্বাধিকার অর্জনের বৈধতা নিশ্চিত করতে। পাশাপাশি নিজের উন্মত্ত, ব্যভিচারী কামবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে শাস্ত্র ও ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারস্থ হয়ে সে বন্দোবস্ত করেছে একাধিক নারীকে ভোগের যথেচ্ছ সুযোগ। এ কারণেই গৃহবধূ বা কুলবধূর অপর হিসেবে উক্ত সমাজে আবির্ভাব ঘটেছে বারবধূ বা পতিতা, সেবাদাসী, উপপত্নী ও রক্ষিতাশ্রেণির। অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য জৈবিক প্রেরণায় প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার যে কোনো নারীর সর্বশেষ অবলম্বন এ হীন বৃত্তি, যদিও প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা স্বতন্ত্র। লক্ষণীয় ব্যাপার হল — ক্ষমতাধর পুরুষতন্ত্রই রাষ্ট্রীয় শক্তি, কর্তৃত্বকে প্রয়োগপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করেছে পতিতাবৃত্তিকে এবং টিকে থাকতে যুগে যুগে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। যে সমাজে নারী শিক্ষাসহ সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত, সেকালে নারীকে রীতিমত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাজসজ্জা, বিলাস-ব্যসন ও কামকলার চৌষট্টি শাখায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত নিশ্চিত করার অন্তরালে প্রতীয়মান হয় গৃহের কুলবধূর সমান্তরালে গণিকালয়ের পতিতাদের প্রতি ভোগাতুর পুরুষের মনোভঙ্গিগত স্বরূপ। স্ত্রীর বিবেচনায় পতিতা অপর, কারণ তার নেই মর্যাদা, শুচিতাবোধ ও সতীত্ব, পুত্রের জননী হওয়ার পরম প্রার্থিত সুযোগ; সর্বোপরি পরিবারের পরিসরে স্বামী বা পতিদেবতার সহধর্মিণী হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি। অন্যদিকে পতিতার প্রমত্ত স্বৈরিণীসুলভ বিবেচনায় গৃহবধূও 'অপর'। কারণ তার নেই যে কোনো পুরুষের দেহসান্নিধ্য লাভের দুর্লভ সুযোগ, স্বাধীনভাবে উপার্জনের অবলম্বন। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করলে প্রতিভাত হয়, পুরুষতন্ত্রই গৃহবধূ ও পতিতার মধ্যে বিদ্যমান অপরতাবোধের জনক এবং এরই দাপটে যে ভূমিকাই পালন করুক না কেন, নারীর অবস্থান ভারতবর্ষে সর্বদাই প্রান্তিকায়িত। মানবী হিসেবে নয়, একান্তই ভোগ্যবস্তু হিসেবে পতিতাকে বিবেচনায় সে অভ্যস্ত। পুরুষতন্ত্রের নিপীড়নে বিগতযৌবনা পতিতার অবশিষ্ট জীবন যাপিত হয় মানবেতর পশু হিসেবে চরম লাঞ্ছনায় এবং এভাবেই তার প্রান্তিকতার পরিধিও ক্রমবিস্তৃত হয়।

১৬. ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ চতুর্বর্ণ প্রথা সৃষ্টির পরবর্তী ধাপে জাতিভেদের মাধ্যমে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুকৌশলে ধর্মের অনুষঙ্গে অস্পৃশ্যতার ধারণাকে ব্যবহার করেছে। এর বীজ উপ্ত রয়েছে *ঋগ্বেদের* 'পুরুষ সূক্তে', যেখানে বিরাট পুরুষের পা থেকে আবির্ভূত বলে শূদ্রের অবস্থান অশুচি, অপবিত্র ও ঘৃণ্য। নিশ্চিতভাবেই এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক উৎপাদন প্রণালি ও শ্রমের গতিশীলতার প্রসঙ্গ। অস্পৃশ্যতাকে ভিত্তি করেই (শেখর, ১৯৯৮ : ৯৪) ক্ষমতালিপ্সু ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী প্রান্তিক জনতাকে 'অস্পৃশ্য', 'অন্ত্যজ', 'দলিত', 'ছোটলোক', 'হরিজন', 'ব্রাত্য' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধায় অভিহিত করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব মানুষের স্পর্শ, সান্নিধ্য এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে দর্শন পর্যন্ত অশুচি, ক্লেদাক্ত বিবেচিত হয়। 'অন্ত্যজ' শব্দের অর্থ হল [অন্ত+জন্+অ(ড)] অন্ত্যবর্ণজাতি বা নীচজাতি (সুবোধ, ১৯৯৯ : ১৩)। অন্ত্যজ অর্থাৎ বর্ণবহির্ভূত সমষ্টিগত মানুষকে নির্দেশ করতে সংস্কৃতে 'চণ্ডাল', উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষায় 'কামিন', ইংরেজিতে 'Untouchables' ও 'outcasts', বাংলায় 'হরিজন', 'দলিত', এবং আইনি পরিভাষায় 'সিডিউল কাস্ট' প্রভৃতি নেতিবাচক অভিধা পরিচিত (ইরফান ও বিজয়, ২০০৬ : ৭৪)। এরা 'নমঃশূদ্র' নামেও সাম্প্রতিককালে অভিহিত। আহমদ

শরীফের মতে, 'তফসিলভুক্ত অস্পৃশ্য বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নিম্নতম বর্ণের মানুষ। মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম, চাঁড়াল, বাগদী প্রভৃতি নমঃশূদ্র নামে পরিচিত।' (উদ্ধৃত, হরিশংকর, ২০০৮ : ১৮)। রামশরণ শর্মা জানিয়েছেন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অর্থাৎ সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা ও আধিপত্যকেন্দ্রিক ভেদাভেদের প্রাচীরকে বিস্তৃত করতেই শূদ্রের স্পর্শকৃত খাদ্য সম্পর্কে ব্রাহ্মণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এ বিধিগত বৈষম্যের শিকার সেই অন্ত্যজশ্রেণির মানুষেরাও, যারা কুকুরের সঙ্গে প্রতিতুলনীয়। তাদের দর্শনে সেই খাদ্য ব্রাহ্মণের জন্য অভোজ্য বিবেচিত হয়। শূদ্র ও অন্ত্যজের স্পর্শকৃত জলও ব্রাহ্মণের জন্য অনাচরণীয়। বশিষ্ঠের মতে, যোগ্যতম ব্রাহ্মণ তিনিই যার উদরে শূদ্রান্ন নেই। অন্ত্যজ-শূদ্রের অন্ন উদরে নিয়ে কোনো ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে তাকে গ্রাম্য শুকররূপে অথবা ঐ কুলেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে (রামশরণ, ১৯৯৯ : ১১৯)। এসবই হচ্ছে শূদ্র ও অস্পৃশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণের সামাজিক ব্যবধানগত কিছু দৃষ্টান্ত। এছাড়া বর্ণসংকরতার দোহাই দিয়ে বিভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্যের কাতারে অবনমিত করা হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে শূদ্র ও অন্ত্যজের ক্ষেত্রে মর্যাদাগত অবস্থান প্রায় একই। ইরফান হাবিব জানিয়েছেন, 'উপজাতি শ্রেণীর মধ্যে অসংখ্য অরণ্যচারী আদিম শিকারী অথবা খাদ্য-সংগ্রাহক উপজাতি যারা অগ্রবর্তী কৃষক গোষ্ঠীর নিকট লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্যের নিকট নিজেদের রীতি-নীতিকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে তারাই বর্ণপ্রথার বাইরে অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য হিসেবে পরিচিত হয়' (ইরফান, ২০০৬ : ১৫৫)। ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব মানুষের স্পর্শ, সান্নিধ্য এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে দর্শন পর্যন্ত অশুচি, ক্লেদাক্ত বিবেচিত হয়। এমনকি সামাজিক জীবনে তাদের উপস্থিতিও বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে বারবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা তাদের স্পর্শ বা দর্শনে বস্তু হারায় শুদ্ধতা, ব্রাহ্মণ তার পবিত্রতা থেকে স্খলিত হয় বলে কথিত (গৌতম ও পার্থ, ২০০৪ : ৬৯-৭০)।

১৭. লেখকের অভিমত —

বঙ্গোপসাগর আমাদের অনেক ব্যথার সাথী। বঙ্গোপসাগরের একেবারে কোলঘেঁষেই উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লীটি। পূর্ণিমা-অমাবস্যার জোয়ারে জেলেপাড়াটি সাগরজলে গোসল করে। ... সমুদ্র আর জেলেপাড়াটির মাঝখানে কোনো আড়াল নেই। আমরা মাছ মারতে সমুদ্রে যাই, আনন্দে সমুদ্রে যাই, বেদনা বোঝাতে যাই সমুদ্রের কাছে। কিন্তু ১৯৭১ সালে সমুদ্র আর আমাদের সখ্যের মাঝখানে এসে দাঁড়াল পাকিস্তানি হানাদাররা। সমুদ্র আর জেলেপাড়াটির মাঝখানের ভূমিটি দখল করে আস্তানা গাড়ল তারা। তারা মাছধরা নিষিদ্ধ করল। সমুদ্রপাড়ে যাওয়া বন্ধ করে দিল। সমুদ্র-বিচ্ছিন্ন হয়ে জেলেরা হাহাকার করে উঠল। মাছ মারতে না পেরে জলবিযুক্ত মাছের মতন খাবি খেতে লাগল। দারিদ্র্য তাদের গলায় ফাঁস পরাল। জেলেদের জলবিচ্ছিন্ন করে ক্ষান্ত হলো না হায়নারা। তাদের দেহসুখ মেটাবার জন্য বেছে নিল আমাদের জেলেপল্লীটিকে। এরা সন্ধেয় আসে, রাতে আসে, পূর্বাহ্নে আসে, অপরাহ্নে আসে। ঘিরে ফেলে এক একদিন এক একটা বাড়ি। শরীর-চাহিদা মিটিয়ে এরা ফিরে যায়। চাপা আর্তনাদে ধর্ষিত নারীরা চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকে। জেলে-পুরুষরা সমুদ্রের দিকে ফিরে চিৎকার করে ওঠে, 'হা মা গঙ্গা, অ বঙ্গোপসাগর, তুমি তোমার জল দিয়ে এই জেলেপাড়াটি ভাসিয়ে নিয়ে যাও। তোমার পবিত্র জলে আমাদের ধর্ষিত নারীদের অপবিত্রতাকে শুচিময় করে তোল।' (হরিশংকর, ২০১২ক : ১৮)

১৮. লেখক জানিয়েছেন —

আমাদের জেলেসমাজ যে নিন্দিত এবং অবহেলিত, তা বুদ্ধি হবার পর থেকে দেখে আসছি। বঞ্চনা আমাদের ঘিরে রাখত। জল-যুদ্ধের শেষে সমুদ্রকূলে নৌকা ভিড়লে মাছ কেড়ে নিত আমাদেরই পরিচিত নিকট প্রতিবেশীরা। মাছ কেড়ে নেবার হিংস্রতা এখনও মাঝে মাঝে আমার চোখে ভেসে ওঠে। তারপর বাজারে লুটপাট। ইচ্ছেমতো দাম দিয়ে মাছ থলিতে ভরে হাঁটা দিত

তারা। তাদের দিকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না আমাদের। প্রতিবাদ করলে মার। মাছের মূল্যের পরিবর্তে বেদম প্রহার। আমার বাবা যুধিষ্ঠির জলদাসের কপালে এই প্রহার জুটেছিল।

ঘাটার আগায় একটা দোকান ছিল আমাদের, সামান্য পুঁজির দোকান। দোকানের আয়ের সঙ্গে মাছমারা আয়ের সমন্বয়ে পরিবার চলত আমাদের। ওই দোকানটাই আক্রমণ করে বসল সন্ত্রাসীরা। কোপাল, লুট করল; তারপর চাইল ভিটেবাড়ি দখল করতে। চাটগাঁইয়া গালির ঝড় বইল। ... এই সব শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে আমার বড় হয়ে ওঠা। (হরিশংকর, ২০১২ক : ৮৪)

১৯. 'প্রান্তজন' হিসেবে নারী উচ্চবর্গের প্রতিভূ পুরুষের দ্বারা পরিবার ও সমাজের গণ্ডিতে প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত ও অধিকারবঞ্চিত। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

'পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। কিন্তু তাই বলে নারীর কোনও শ্রেণীগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এও সত্য নয়। সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায়, ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়।' (গৌতম ও পার্থ, ২০০৪ : ১২)

ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি সাংস্কৃতিক পরিসরেও নারীর ওপর পুরুষের অহমবোধ প্রতিষ্ঠিত। যখন থেকে সমাজে পুরুষতন্ত্রের দাপট বিস্তৃত হয়েছে, সেই ক্রান্তিলগ্নেই বহির্জগতের বহুধাবিস্তৃত পরিসর থেকে পুরুষের নিষ্ঠুরতায় নারীর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ও মানবসুলভ পরিচিতি ক্রমশই অবলুপ্ত হয়েছে। তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে গৃহের সংকীর্ণ পরিসর, গার্হস্থ্যকর্মের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হওয়ার বিকল্পহীন বাধ্যবাধকতা। অতঃপর যাকে পরিবার ও সমাজের অসংখ্য অনুশাসন, রীতি-নীতির পীড়নে সর্বদাই জর্জরিত হতে হয় এবং একপর্যায়ে সে বিস্মৃত হতে বাধ্য হয় তার নারীসুলভ একান্ত সাধ-আহ্লাদ, নিজের অন্তর্গত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করার আকাঙ্ক্ষা; ভারতীয় নিম্নবর্গ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বিবেচনায় সেই নারী অবশ্যই 'অন্তেবাসী' হিসেবে অবনমিত। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'Can the Subaltern Speak' প্রবন্ধে অপরতাবোধের আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশে নিম্নবর্গের নারীর প্রান্তিকতার স্বরূপ নতুন তাৎপর্যে সনাক্ত করেছেন। বৈদিক যুগ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালপরিসরে ভারতবর্ষীয় নারীর জীবন একান্তই শৃঙ্খলিত এবং পরাধীনতার নাগপাশে অবরুদ্ধ ছিল, যার প্রধানতম কারণ পিতৃতন্ত্র প্রণীত অসংখ্য আইন, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও সামাজিক অনুশাসনের সুপরিকল্পিত পীড়ন। হিন্দু পিতৃতন্ত্রে তিন প্রধান পুরুষ পিতা, স্বামী ও প্রভুর বর্তমানে নারী কখনো সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। এ সমাজে নারীর স্বাধীনভাবে একাকী কুমারী বা অনূঢ়া অবস্থানের সুযোগ রুদ্ধ হয় নিম্নোক্ত বিধানের দ্বারা — 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি' : কুমারীকালে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রেরা রক্ষা করবে নারীকে, নারী স্বাধীনতার অযোগ্য' (হুমায়ুন, ২০০৯ : ৩১)। নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পিতৃতন্ত্র অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সর্বদাই রেখেছে পুরুষের আয়ত্তে। যেহেতু অর্থের ওপর ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সুযোগ নির্ভরশীল, তাই পিতৃতন্ত্র এ কৌশলের দ্বারস্থ হয়েছে ধর্মীয় দোহাইয়ের ছলে। এভাবেই প্রাচীন যুগ থেকে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যে বহির্জগতের মুক্ত পরিসর থেকে গৃহের সংকীর্ণ গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত নারীর প্রান্তিকতা পরিব্যক্ত হয়েছে, যেখানে তার মানবীসত্তা অবলুপ্ত (সুকুমারী, ১৪০৮ : ৩৯-৪০)।

২০. 'সতীত্ব' পুরুষতন্ত্র কর্তৃক নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর মতবাদ। নারীর কৌমার্য, চরিত্রগত শুদ্ধতা বা সতীত্বের প্রতি পিতৃতন্ত্র যে অত্যন্ত সতর্ক, তার কারণ সে নারীকে তার সহযোগী হিসেবে বিবেচনায় অসম্মত। পিতৃতন্ত্রে নারী সর্বদাই পুরুষের

অনুগত দাসী এবং তার দেহের ওপর পুরুষ চায় নিরংকুশ কর্তৃত্ব। অর্থাৎ নারীর থাকবে না কোনো যৌন স্বাধীনতা। কর্তা হিসেবে পরিবারের পিতা, স্বামী বা ভাইয়ের নিয়ন্ত্রণ তার ওপর সর্বদাই প্রযুক্ত করার তাগিদ থেকে এ অবমাননাকর ধারণার উদ্ভব। 'সতী'র নেই কোনো পুরুষবাচক শব্দ। 'সৎ' বিশেষণটি পুরুষের চারিত্রিক শুদ্ধতা বিচারের মাপকাঠি হিসেবে প্রয়োগের কখনো প্রয়োজন হয়নি। কারণ, পুরুষের বহুগামিতা ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজনীতিতে সর্বদাই স্বাভাবিক বিবেচিত, স্বীকৃত। আধুনিক যুগে নারীর চারিত্রিক শুদ্ধতা ও স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সতীত্বের ধারণা কতটা যুক্তিনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য, সে সম্পর্কে দুজন বিশিষ্ট নারীব্যক্তিত্বের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

ক. সুকুমারী ভট্টাচার্য : সমস্ত 'সতী' কথাটার মধ্যে একটা ভণ্ডামি আছে। 'ভণ্ডামি' বলার কারণ 'সতীত্ব'র জন্য যে নীতি নির্ধারিত আছে (যেমন, যথেষ্ট স্বামী সেবা করা, শ্বশুরবাড়ির সেবা করা, যখন তখন স্বামীর প্রীতি সঞ্চারণ করা ইত্যাদি) তার সবকটা কাজই ভাল না বেসেই করা যায়। এই ধরনের একান্ত আনুগত্য তো দাস, প্রভুকে দেয় । এখানে ভালবাসার কোনও সম্পর্ক নেই। প্রেম নিরপেক্ষ একটা আচরণের কথা এই শাস্ত্রে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রেম থাকতেই পারে, কিন্তু না থাকলেও কোনও ক্ষতি নেই। তবে এতে মহিলাদের জন্য শেকলবেড়ি অনেক মজবুত করে তৈরি হল, যার নাম সতীত্ব। [অপর্ণা, ১৯৯১ : ২৮]

খ. প্রতিভা বসু : সতী শব্দের বিপরীত শব্দ অসতী। অর্থাৎ এই শব্দের কোনো পুংলিঙ্গ নেই। মেয়েদের সতী বানাতেও পুরুষের প্রয়োজন, অসতী বানাতেও পুরুষের প্রয়োজন। তা হ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে একজন পুরুষ ব্যতীত একটি মেয়ে সতীও হ'তে পারে না অসতীও হতে পারে না। বিবাহিত মেয়ে সম্পর্কেই সতী শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তার মানে মেয়েটি যাকে বিবাহ করেছে সেই ব্যক্তি যেমনি হোক চরিত্রহীন বা ঠক বা জোচ্চোর মিথ্যেবাদী মাতাল তাকেই যে-স্ত্রী স্বামী প্রভু কর্ত্তাভর্ত্তা মালিক এই সমস্ত বিশেষণে ভূষিত করে, খেতে দিতে পারুক না পারুক, মেরে ধরে সাতবার গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিক তথাপি তাকেই গুরু বলে মনে করে সব সহ্য করবে সেই সতী। ব্যক্তিত্ব বা ন্যায়-অন্যায় বোধে যে-মেয়ে সেই স্বামীর যথেচ্ছ ব্যবহার সহ্য করতে না পারবে সে অসতী। অর্থাৎ দোষটা করবে পুরুষ শাস্তিটা পাবে মেয়ে। এর চেয়ে জঘন্য নিয়ম আর কী হ'তে পারে মানুষের জীবনে। আমার মতে অভিধান থেকে এই অভদ্র শব্দ দু'টি মুছে দেয়া একান্ত কর্তব্য। (অপর্ণা, ১৯৯১ : ৩৩)

২১. লেখক জানিয়েছেন —

পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হবার জন্য যখন বাঙালিরা আত্মবিসর্জনে মগ্ন, তখন কর্ণফুলী একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকেনি। এই নদীর বুক চিরে মুক্তিকামীদের নৌকা হানাদারদের ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছে। নদীজলে দাঁড়ানো জলযানে মুক্তিযোদ্ধারা নদীপথ বেয়ে এসেই আগুন দিয়েছে। বোনাই আমার মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। উত্তর পতেঙ্গায় হানাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের পরিবার গ্রাম ছেড়েছিল। মাইজপাড়াতেই আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। কালো কাদার জেলেপল্লী বলে হানাদাররা মাইজপাড়া এড়িয়ে চলত। সেই সময়ে গভীর রাতে শুনতাম– জগৎ হরির দরজায় টোকা পড়ছে। কানে ভেসে আসত, 'একটু যে আমাদের সাথে যেতে হবে জগৎবাবু, নৌকা নিয়ে। কর্ণফুলীর ওপাড়ে চরপাথর ঘাটায় আজকে যে একটা অপারেশন আছে।' চুপিসারে বেরিয়ে পড়তেন বোনাই (লেখকের ঠাকুমা পরাণেশ্বরীর একমাত্র সহোদর জগৎহরি)। সকালে তাঁকে নায়ক বলে মনে হতো আমার। রাতে কোথায় গিয়েছিলেন– জানতে চাইলে মৃদু হাসতেন শুধু, মুখে কিছু বলতেন না। তো, আমার সেই বোনাই জগৎহরি পাকিস্তানি মিলিটারিদের গুলিতেই প্রাণ হারালেন একদিন। এই কর্ণফুলীর জলেই ভেসে গিয়েছিল তাঁর লাশ। (হরিশংকর, ২০১২ক : ১৩)

গ্রন্থপঞ্জি

অপর্ণা সেন (সম্পাদিত), ১৯৯১। *সানন্দা*, ৫ম বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২১ মার্চ ১৯৯১, কলকাতা।

ইরফান হাবিব, ২০০৬। *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর, ২০০৬। *বৈদিক সভ্যতা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ২০০৪। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

জহর সেনমজুমদার, ২০০৭। *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

মোঃ মতিউর রহমান, ২০১০। *উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রবন্ধাবলী*, খণ্ড ৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মিল্টন বিশ্বাস, ২০০৯। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রামশরণ শর্মা, ১৯৯৯। *প্রাচীন ভারতে শূদ্র*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), ১৯৯৮। *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, ১৪০৮। *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

সুবোধ দেবসেন, ১৯৯৯। *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ, ২০০৯। *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হরিশংকর জলদাস, ২০০৮। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হরিশংকর জলদাস, ২০১১। *কৈবর্তকথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

হরিশংকর জলদাস, ২০১২। *জলদাসীর গল্প* (তৃতীয় মুদ্রণ), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

হরিশংকর জলদাস, ২০১২ক। *নিজের সঙ্গে দেখা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।